ইউনিট-৩

জনসংখ্যা

ভূগোল শাস্ত্রে জনসংখ্যা বিষয়ক পঠন-পাঠন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা জনসংখ্যার সাথে মানবিক ভূগোলের বিভিন্ন বিষয়াদি ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কযুক্ত (পূর্ববর্তী ইউনিটসমূহ দ্রষ্টব্য)। জনসংখ্যা ভূগোল একটি পৃথক শাখা হিসাবে বিংশ শতাব্দীর ৬০ দশকের পর হতে দ্রুত বিকাশ লাভ করে। এই বিকাশের পেছনে আন্তর্জাতিক ভূগোল ইউনিয়ন জনসংখ্যা কমিশনের অবদান ও কৃতিত্ব রয়েছে। জনবহুল দেশ হিসাবে বাংলাদেশেও বিষয়টি গুরুত্ব লাভ করেছে এবং উল্লেখযোগ্য শাখা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

ভৌগোলিক অর্থে জনসংখ্যা বলতে নির্দিষ্ট ভূ-খন্ডে বসবাসকারী এবং সার্বিকভাবে সম্পর্কযুক্ত কোন জনগোষ্ঠী বা জনসমষ্টিকে বুঝানো হয়ে থাকে। বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও নির্দিষ্ট অঞ্চল বা দেশের জনসংখ্যা একক সত্ত্বামূলক বিষয় হিসাবে বিবেচনা করা হয়। আবার এই এককের মধ্যেও জনসংখ্যার বিশেষ অবস্থান, বিন্যাস ও বন্টন, ঘনত্ব, পরিবর্তন প্রক্রিয়া,সংগঠন প্রভৃতি একাধিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এসমস্ত বৈশিষ্ট্যের উল্লেখযোগ্য উপাদানসমূহের পর্যালোচনা এই ইউনিটের মূল উদ্দেশ্য।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ হচ্ছে-

পাঠ-৩.১: *জনসংখ্যা বন্টন এবং ঘনত্ব*

পাঠ-৩.২: *জনসংখ্যা পরিবর্তনের প্রক্রিয়া: প্রজননশীলতা*

পাঠ-৩.৩: *জনসংখ্যা পরিবর্তনের প্রক্রিয়া: মরণশীলতা*

পাঠ-৩.৪: *অভিগমন: কারণ*

পাঠ-৩.৫: *অভিগমন: শ্রেণীবিভাগ*

পাঠ-৩৬: *অভিগমনের সামগ্রিক শ্রেণীতত্ত্ব*

পাঠ-৩.৭: *জনসংখ্যা বৃদ্ধি: ঐতিহাসিক ধারা*

পাঠ-৩.৮: *জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার ও জনসংখ্যা আকার*

পাঠ- ৩.৯: *জনসংখ্যা কাঠামো: বয়:কাঠামো*

পাঠ-৩.১০: *জনসংখ্যা কাঠামো: বয় পিরামিড*

পাঠ-৩.১১: *জনসংখ্যা কাঠামো : বৈবাহিক কাঠামো*

পাঠ-৩.১২: *জনসংখ্যা কাঠামো : অর্থনৈতিক কাঠামো*

পাঠ-৩.১৩: *জনসংখ্যা কাঠামো : শিক্ষা কাঠামো*

পাঠ-৩.১৪: *জনসংখ্যা কাঠামো : ভাষা*

পাঠ-৩.১৫: *জনসংখ্যা কাঠামো : ধর্ম*

পাঠ-৩.১৬: *জনসংখ্যা পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন*

পাঠ ৩.১৭: *জনসংখ্যা পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন: জনসংখ্যার প্রবণতা*

পাঠ-৩.১ জনসংখ্যা বন্টন এবং ঘনত্ব

এই পাঠ শেষে আপনি-

- জনসংখ্যার বন্টন;
- জনসংখ্যা বন্টনে প্রভাব বিস্তারকারী নিয়ামক; এবং
- জনসংখ্যার ঘনত্ব সম্পর্ক ধারনা পাবেন।

পৃথিবীর জনসংখ্যার আকারগত পরিবর্তনের আঞ্চলিক বিভিন্নতা বিশেষ লক্ষ্যণীয়। জাতিসংঘের তথ্যানুযায়ী বর্তমানে পৃথিবীর জনসংখ্যা প্রায় ৬.৯ বিলিয়ন এর মধ্যে উন্নত দেশে প্রায় ২.১ বিলিয়ন এবং বিকাশশীল দেশে ৪.৮ বিলিয়ন জনসংখ্যা রয়েছে। উন্নত বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশ হচ্ছে রাশিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্র। এই দুইটি দেশে উন্নত বিশ্বের প্রায় ৪০ শতাংশ লোক বাস করে। ৫০ মিলিয়ন বা অধিক জনসংখ্যাযুক্ত দেশগুলি হচ্ছে জাপান (১২০ মি.), ইটালী (৬০ মি.), যুক্তরাজ্য (৬০ মি.) এবং ফ্রান্স (৫৮ মি.)। উন্নত অঞ্চলের প্রায় ৭০ শতাংশ লোক এই সাতটি দেশে বাস করে।

জনসংখ্যার বন্টন

বিকাশশীল দেশ গুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনবহুল দেশ হচ্ছে চীন এবং ভারত। ২০১০ সালে এদের জনসংখ্যা যথাক্রমে বিলিয়ন ১.৪ এবং ১.২ বিলিয়ন ছিল। এই দুইটি দেশে বিকাশশীল বিশ্বের প্রায় ৫০ শতাংশ লোক বাস করে। একমাত্র চীনেই পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ২০ শতাংশেরও বেশি লোক বাস করে। ১০০ মিলিয়ন বা তার বেশী জনসংখ্যাবহুল দেশগুলো হচ্ছে ইন্দোনেশিয়া (২৩২.৫ মি.) ব্রাজিল (১৯৫.৪ মি.), পাকিস্তান (১৮৪ মি.), বাংলাদেশ (১৬৪ মি.), নাইজেরিয়া (১৫৮.৩ মি.) এবং মেক্সিকো (১০৭ মি.)। কিন্তু ভারতসহ এই ছয়টি দেশে বিকাশশীল অঞ্চলের প্রায় ৫০ শতাংশ লোক বাস করে। সারণী ৩.১.১ থেকে বিশ্ব জনসংখ্যার আঞ্চলিক বিন্যাস সম্পর্কে একটা সরলীকৃত ধারণা পাওয়া যায়। এশিয়া এবং ইউরোপে জনসংখ্যার আধিক্য দেখা যায়-বিশ্বের তিন-চতুর্থাংশের অধিক অধিবাসী এই দুইটি মহাদেশে বাস করে। প্রায় ১০ শতাংশ লোক দক্ষিণ গোলার্ধে বাস করে। অক্ষাংশ অনুযায়ী বিন্যাস ধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, ১০ শতাংশের সামান্য বেশী জনসংখ্যা বিষুবীয় রেখার ২০° উ. অক্ষাংশের মধ্যে এবং প্রায় ৫০ শতাংশ ২০° উ., ৩৮° উ., ৩০ শতাংশ ৪০° উ. এবং ৬০° উ. এবং ০.৫ শতাংশেরও কম জনসংখ্যা ৬০° উ. অক্ষাংশের উত্তরে বসবাস করে। অর্থাৎ প্রায় তিন-চতুর্থাংশ বিশ্ব জনসংখ্যা ২০°-৬০° উ. অক্ষাংশের মধ্যে বাস করে। পৃথিবীর প্রধান মরুভূমি এবং পর্বতমালার অবস্থান সত্ত্বেও এই অঞ্চলে দুইটি প্রধান জনবহুল অঞ্চল রয়েছে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া (যেখানে বিশ্ব জনসংখ্যার অর্ধেক জনসংখ্যার মাত্র ১০ শতাংশ এই ভূ-ভাগে বসবাস করে) এবং ইউরোপ (যেখানে বিশ্বের এক-পঞ্চমাংশ জনসংখ্যা ০.৫ শতাংশ ভূ-ভাগে বসবাস করে)।

সারণী ৩.১.১: বিশ্ব জনসংখ্যার আঞ্চলিক বিন্যাস, ২০১০

মহাদেশ ও অঞ্চল	জনসংখ্যা (বিলিয়ন)	বৃদ্ধি %
এশিয়া	৪.১৬	১.১
আফ্রিকা	১.০৩	২.৩
ইউরোপ	০.৭৩	০.১
ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান	০.৫৮	১.১
উত্তর আমেরিকা	০.৩৫	১.০
ওশোনিয়া	০.০৫৮	১.৩
মোট	৬.৮৯	১.২

দ্বিতীয় জনবহুল অঞ্চলসমূহ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় দেখা যায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য এলাকাগুলি হলো: উত্তর আমেরিকার পূর্বভাগ, ক্যালিফোর্নিয়া, উপকূলীয় ব্রাজিল, নীল ব-দ্বীপ, পশ্চিম আফ্রিকা এবং দক্ষিণ-পূর্ব অস্ট্রেলিয়া। উল্লেখ্য যে, বিশ্বের প্রায় জনসংখ্যাহীন এলাকাগুলি ঘন জন অধ্যুষিত এলাকার চেয়ে আয়তনে অনেক বড়।

জনসংখ্যার আকার এবং ঘনত্বের মধ্যে দেশ-পর্যায়ে মারাত্মক অসামঞ্জস্য রয়েছে। এশিয়া মহাদেশে ১৫০ মিলিয়নের অধিক জনসংখ্যা সম্পন্ন ৬টি দেশ রয়েছে: চীন, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, জাপান এবং ইন্দোনেশিয়া। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই অঞ্চলে বিশ্ব জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যার আবাস। পক্ষান্তরে পশ্চিমে আফ্রিকার প্রায় ১০৩ মিলিয়ন জনসংখ্যা ১৫টি দেশে বসবাস করে। আবার প্রায় সম সংখ্যক অতি ক্ষুদ্র স্বল্প জনসংখ্যার দেশ দেখা যায়।

বিশ্ব জনসংখ্যা বন্টনে এত বেশি ধরনের অসামঞ্জস্য রয়েছে যে, স্বল্প পরিসরে পর্যালোচনা সম্ভব নয়। এই বন্টন অঞ্চল বিশেষের পরিবেশগত অবস্থান এবং মানুষের বাস্তব্য প্রভাবের কারণে বিক্ষিপ্ত থেকে শুরু করে অসমান বন্টন হতে পারে। এমন কি অতি ঘন জনবহুল স্থানেও জনবিরল বা জনহীন অরণ্য ভূমি ও বিস্তৃর্ণ তৃণভূমি থাকতে পারে। আবার জনবিরল অঞ্চলেও সহসা খনিজ বসত বা সামরিক কেন্দ্রের কারণে জনবহুল লোকালয় দেখা যায়।

জনসংখ্যা বন্টনে প্রভাব বিস্তারকারী নিয়ামক

প্রাকৃতিক উপাদান বা পরিবেশ পুরোপুরিভাবে জনসংখ্যা বন্টনকে প্রভাবিত করে এমন দেখা যাবে না। তবে কোন কোন এলাকায় প্রাকৃতিক পরিবেশ জনসংখ্যা বন্টন নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। অপর দিকে জনসংখ্যা বন্টনে বিবিধ সামাজিক, জনমিতিক, আর্থনীতিক, রাজনৈতিক এবং ঐতিহাসিক নিয়ামক কার্যকর প্রভাব বিস্তার করে। এ সমস্তের আলোকেই কোন অঞ্চলের বা দেশের জনসংখ্যা বন্টন ব্যাখ্যা করা উচিত। প্রকৃত পক্ষে জনসংখ্যা বন্টন একটি চলমান প্রক্রিয়া এবং এর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সময় ও পরিসর ভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। নিম্নে জনসংখ্যা বন্টনের কতিপয় মূল উপাদান আলোচনা করা হলো।

মহাদেশীয় নিরাপত্তা : সাধারণভাবে জনসংখ্যা মহাদেশসমূহের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বিন্যাসিত হয়ে থাকে এবং উপকূলভাগ থেকে যত অভ্যন্তরে যাওয়া যাবে জনসংখ্যার বিন্যাসও তত বেশি বিক্ষিপ্ত ও বিরল হয়ে থাকে। তিন-চতুর্থাংশ জনসংখ্যা সমুদ্র উপকূল থেকে ৯৬০ কি.মি. এবং দুই-তৃতীয়াংশ ৪৮০ কি.মি এর মধ্যে বিন্যাসিত। অর্থাৎ সাধারণভাবে বলা যায়, উপকূলভাগ জনসংখ্যাকে আকৃষ্ট করে এবং জনসংখ্যার মধ্যে মহাদেশীয় অবস্থান পরিহার করার প্রবণতা আছে। এক্ষেত্রে জলবায়ু এবং বাণিজ্যিক নিয়ামক প্রধান কার্যকর প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অবস্থান, আকৃতি এবং আয়তন জনসংখ্যা বন্টনের উপর, বিশেষ করে, শীতল অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। মহাদেশের অভ্যন্তরে উত্তরাঞ্চলের উচ্চ দ্রাঘিমায় উলম্ব বিস্তৃতি এবং সীমিত মহাসাগরীয় যোগাযোগ জনসংখ্যা বিন্যাসের বিস্তৃতি যথেষ্ট সীমিত করেছে। দক্ষিণাঞ্চলের সঙ্কীর্ণ বিস্তৃতি উচ্চ দ্রাঘিমাংশে অনুরূপ প্রভাব বিস্তার করেছে। অপরদিকে নিরক্ষীয় দক্ষিণ আমেরিকা এবং আফ্রিকায় সরাসরি ক্রান্তীয় অরণ্যভূমি ও মরুভূমির অবস্থানের জন্য জনসংখ্যা বন্টন সীমিত হয়েছে। অনেক সময় মনে করা হয় যে, পরিবেশগত সংরক্ষণতা বা সীমিত অবস্থান বিশেষ করে মধ্য ও নিম্ন দ্রাঘিমার দেশসমূহে, যেমন - বৃটেন, জাপান, শ্রীলঙ্কা, মাল্টা, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, তাইওয়ান, ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জ ইত্যাদির জনসংখ্যা সংগঠিত বিন্যাসের রূপদান করেছে। এ সমস্তের স্থান বিশেষের আকার, অবস্থান, ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক পটভূমিকা এবং অর্থনীতিক সম্ভবনা গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণেই প্রায় ৫,৩৭৬ ব. কি. মি. আয়তন বিশিষ্ট কর্সিকার তুলনায় মাত্র ১৯২ কি.মি. আয়তন বিশিষ্ট মাল্টায় অধিক জনসংখ্যা বাস করে (চিত্র ৩.১.১)।

উপকূলভাগে জনসংখ্যা বন্টনের যথেষ্ট বৈষম্য দেখা যায়। বন্দর ও পোতাশ্রয়ে ব্যবসা, বাণিজ্য ও আর্থনীতিক কারণে ঘন বিন্যাসিত জনসংখ্যা দেখা যায়। বিশেষ করে বিশ্বের অধিকাংশ জনবহুল নগর বিকাশ করেছে উপকূলীয় অঞ্চলে।

জনসংখ্যার উলম্ব বিন্যাস : প্রামাণিত যে, জনসংখ্যা এবং এর ঘনত্ব উচ্চতর সাথে নিম্নগামী হয়। বিষয়টি উচ্চতা জনিত পরিবেশে মানবীয় কর্মকান্ড ও জীবিকা কষ্টসাধ্য বলেই ঘটে থাকে। সাধারণভাবে প্রায় ৫৬ শতাংশ বিশ্ব জনসংখ্যা সমুদ্রতল থেকে ২০০ মিটারের মধ্যে এবং মাত্র ২৮ শতাংশ ভূ-ভাগে বাস করে। এই অঞ্চলে জনসংখ্যার ঘনত্ব বিশ্ব গড় ঘনত্বের দ্বিগুন। ৫০০ মিটারের নিচে ৫৭ শতাংশ ভূ-ভাগে বিশ্ব জনসংখ্যার ৮০ শতাংশ লোক বাস করে।

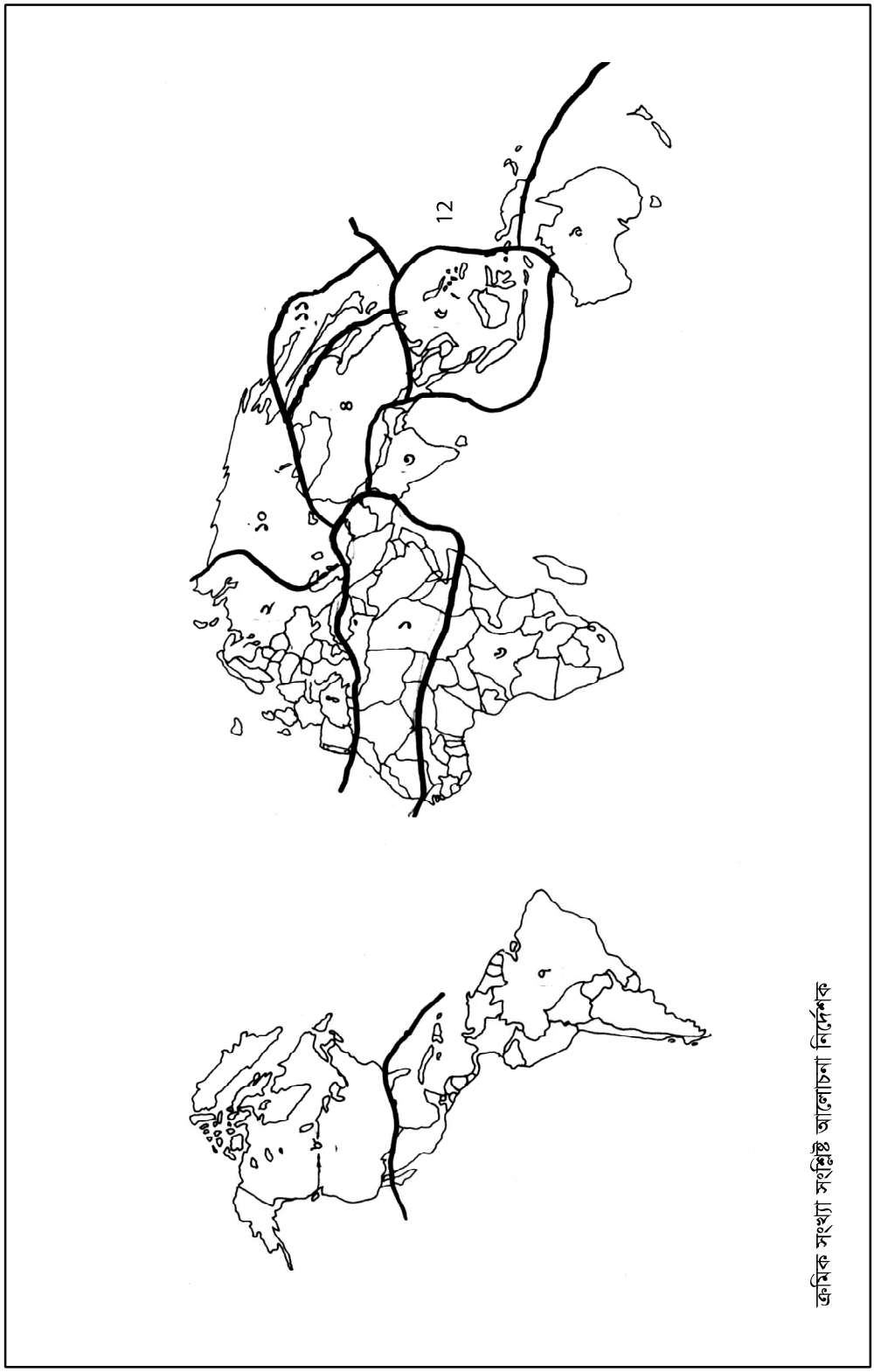

চিত্র: ২.৮.১: বিশ্ব সাংস্কৃতিক অঞ্চল

এশিয়া মহাদেশের বিশাল জনসংখ্যার উচ্চতা ভেদে বিন্যাস বিশ্ব জনসংখ্যার বন্টনকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করেছে। উচ্চতা হিসাবে বিশ্বে জনসংখ্যা বিন্যাস ৩২০ মি. গড় উচ্চতায় হলেও বিভিন্ন মহাদেশে গড় উচ্চতা বিভিন্ন ধরনের ; যেমন:

আফ্রিকা ৫৯০ মিটার	উ: আমেরিকা ৪৩০ মিটার
এশিয়া ৩১৯ মিটার	দ: আমেরিকা ৬৪৪ মিটার
অস্ট্রেলিয়া ৯৫ মিটার	ইউরোপ ১৬৮ মিটার।

অর্থনৈতিক কারণ এবং ভূ-বন্ধুরতার মাত্রা ছাড়াও শারীরিক ও স্বাস্থ্যগত কারণে অতি উচ্চতায় জনসংখ্যা বসবাস করে না। নির্দিষ্ট কতিপয় স্থানে অতি উচ্চতায় বসবাসের জন্য জনসংখ্যাকে পরিবেশের সাথে যথেষ্ট মাত্রায় খাপ খাওয়াতে হয় - যেমন হিমালয় ও এ্যান্ডিজ অঞ্চলে স্থায়ী জনবসত ৫০০ মিটারের মধ্যে দেখা যায়। তবে ৭০০০ মিটার উচ্চতায় জনবসত গড়ে ওঠে না।

উচ্চতার সাথে দ্রাঘিমার একটি সম্পর্ক রয়েছে যা এরূপ ভূ-সংস্থানযুক্ত স্থানে জনসংখ্যা বন্টনে ভূমিকা রাখে। নিম্ন দ্রাঘিমায় জনসংখ্যার বসবাসের জন্য উচ্চতা ইতিবাচক প্রভাব ফেলে কেননা উচ্চতা ভেদে জলবায়ুগত উপাদান, বিশেষ করে তাপমাত্রা, সহনশীল হয়ে থাকে। ইথিওপিয়া, নেপাল ও ভারতের হিমালয়ের পাদদেশীয় অঞ্চল এবং ল্যাটিন আমেরিকায় নিম্ন আন্ডিজে এ কারণে ব্যাপক স্বাস্থ্যকর জনবসত গড়ে উঠেছে। এই সমস্ত এলাকায় বেশ কিছ শহরের বিকাশ উচ্চতাজনিত কারণে ঘটেছে।

জনসংখ্যা ও ভূ-সংস্থান : খাড়া ঢাল, ভূমির বন্ধুরতা ও বৃক্ষহীনতা চাষাবাদ বা বসত স্থাপনের জন্য মানুষকে আকৃষ্ট করে না। কিছু কিছু প্রাকৃতিক অসুবিধা প্রযুক্তি প্রয়োগের ফলে অতিক্রম করা গেলেও সাধারণভাবে এ ধরনের ভূ-প্রকৃতি জনবসত বিকাশ এবং জনসংখ্যা বিন্যাসের জন্য সুবিধাজনক নয়। তবে যেখানে জন আধিক্য রয়েছে এবং ভূমি-স্বল্পতা (যেমন, হংকং ও জাপান) এবং নিরাপত্তার বিষয় (পূর্ব আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চল) জড়িত সেখানে জনসংখ্যার বিস্তার অপরিহার্য দেখা গেছে। আবার অর্থনৈতিক কারণে যাযাবররা বন্ধুর ভূ-প্রকৃতিতে তাদের চারণভিত্তিক কর্মকান্ড অভ্যস্ত হওয়ায় জনবসত গড়ে তুলেছে। উত্তর আফ্রিকায় মরুদেশ থেকে তিউনিস এবং পূর্ব তুরস্ক, উত্তর ইরান ও উত্তর ইরাকে জনসংখ্যার বন্টনে এ সমস্তের প্রভাব বিদ্যমান।

অপরদিকে উত্তর ও মধ্য দ্রাঘিমার উষর পার্বত্য অঞ্চলে অতি জনবিরল অবস্থা বিরাজ করছে। এ সমস্ত অঞ্চলের দক্ষিণের সমভূমিতে আবার জনসংখ্যা বন্টনে বৈপরীত্য দেখা যায়- সমভূমিতে জনসংখ্যা বন্টন ও ঘনত্বের ক্রম বর্ধমান গতি লক্ষণীয়। পার্বত্য উপত্যকা এবং গিরিপথ সন্নিহিত এলাকায় গুচ্ছবদ্ধ জনসংখ্যার বসত দেখা যায়। স্কটল্যান্ডের পাহাড়ী অঞ্চল, নিউজিল্যান্ড এবং তাসমেনিয়ায় এরূপ জনবিন্যাস দেখা যায়। উন্নত বিকাশশীল বিশ্বের অনেক পাহাড়ীয়া অঞ্চলে জনসংখ্যা বন্টনে নিম্নগতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

প্রধানত: পাহাড়-ভিত্তিক সম্পদের প্রাপ্যতা, বিশেষ করে বননিধন অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার অভাব, নিরাপত্তা এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত কারণে সনতান পেশার উপর চাপ এই ধরনের জনসংখ্যা বন্টন পরিবর্তনের প্রধান কারণ। বিশেষ করে, নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের পাহাড়ে যেখানে কৃষি ভূমির স্বল্পতা রয়েছে সেখানে এই পরিবর্তন দ্রুত। অপরদিকে, পাদদেশীয় পাহাড়ী অঞ্চল ঐতিহাসিকভাবে ঘন জনসংখ্যাযুক্ত এলাকা বলে পরিচিত। মধ্য স্কটল্যান্ড, উত্তর-পূর্ব ইংল্যান্ড, পূর্ব ও পশ্চিম পাদদেশীয় যুক্তরাষ্ট্র এর উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। কিন্তু সমভূমি সব সময় জনসংখ্যা বিস্তারের জন্য আকর্ষণীয় স্থান। বিশাল আর্দ্র নিরক্ষীয় এবং নদী বিধৌত অঞ্চল সব সময় জন অধ্যুষিত দেখা গেছে। গঙ্গা-যমুনা-মেঘনা

নদীর পরিবাহ অঞ্চলের প্লাবনভূমি পৃথিবীর অন্যতম জন অধ্যুষিত অঞ্চল। তবে অনেক সমভূমি প্রাকৃতিক কারণে এখনও জনবিরল, যেমন আমাজন ও কঙ্গো প্লাবন ভূমি, সাহারা এবং সাইবেরিয়ার সমভূমি ইত্যাদি।

উপরোক্ত পরিস্থিতির কারণে দেখা যাচ্ছে যে, জনসংখ্যার সাধারণ বন্টনের সাথে বিশ্ব ভূ-সংস্থান মানচিত্রের একটা ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে।

জনসংখ্যা ও জলবায়ু : জনসংখ্যার বন্টনের উপর জলবায়ুর প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে কেবল শারীরিক ও স্বাস্থ্যগত কারণেই নয়, বরং পরোক্ষভাবে জলবায়ুর সাথে মৃত্তিকা, উদ্ভিজ এবং কৃষি ব্যবস্থাও সরাসরি জড়িত যা জনবসত ও জনসংখ্যা বিকাশকে প্রভাবিত করে। সাধারণভাবে জনসংখ্যার দীর্ঘস্থায়ী আবাস নির্দিষ্ট তাপমাত্রা সীমার মধ্যে সংগঠিত হয়ে থাকে। এজন্য অনেক ভূগোলবিদ এমনও মনে করেন যে, মানুষের অভিগমন, সংস্কৃতি ও সভ্যতার মূলভিত্তি জলবায়ুর সাথে সংশ্লিষ্ট। তবে এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রাকৃতিক নিমিত্তবাদের অন্তর্ভুক্ত এবং এর বিরোধী মতবাদও রয়েছে। কেননা, প্রযুক্তি বিকাশের সাথে সাথে জলবায়ুগত অনেক উপদানের বাধ্যবাধকতা বিশেষ করে, তাপমাত্রার পরিবর্তন করা গেছে যার ফলে শীতল বা উষ্ণ অঞ্চলে জনবসত বিকাশ সম্ভব হয়েছে।

তবুও সামগ্রিকভাবে অতি শীতল অঞ্চল জনসংখ্যা বন্টন ও বিন্যাসের উপযোগী নয়। ঠিক তেমনি অতি উষ্ণ ও উষর জলবায়ু অঞ্চল এখনও প্রধানত: জনবিরল। বিশ্বের প্রায় মেরু অঞ্চল এত শীতল যে চাষাবাদ সম্ভব নয় যার ফলে স্থায়ী জনসংখ্যার বসত গড়ে ওঠে নাই। উষ্ণ মরু অঞ্চল প্রধানত: জনবিরল হলেও অনিয়মিত বৃষ্টিপাত অঞ্চলে বা মরুদ্যান এলাকায় ঘন জনসংখ্যার পুঞ্জিভূত অবস্থান লক্ষ্যণীয়। আবার মরুপ্রায় অঞ্চলে পানি সেচের ফলে কৃষিকাজের বিকাশের সাথে সাথে জনসংখ্যার বিস্তৃতি ঘটেছে। উত্তর-পশ্চিম ভারত, সিন্ধু ও নীল অববাহিকার জনসংখ্যা বিন্যাস এর উদাহরণ। এছাড়াও অতি চরমভাবাপন্ন জলবায়ু অঞ্চলে খনিজ এলাকা বা বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা কেন্দ্রগুলিতে সংঘবদ্ধ গুচ্ছাকার জনবসত দেখা যায়।

জনসংখ্যা ও মৃত্তিকা : প্রধানত পরিবেশের অন্যান্য উপাদানের মতই জনসংখ্যা বন্টনের উপর মৃত্তিকার প্রভাব অনস্বীকার্য। দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়া এবং নীল ব-দ্বীপ অঞ্চলের উর্বর মৃত্তিকাযুক্ত অঞ্চল ঘন সন্নিবেশিত কৃষিভিত্তিক জনসংখ্যা বন্টন দেখা যায়। জনসংখ্যা বিন্যাসধারা স্তেপ অঞ্চলের শার্নোজেম মৃত্তিকা এবং আগ্নেয়গিরি বলয়ে অগ্ন্যুৎপাতিক ভস্ম মৃত্তিকা অঞ্চলে দেখা যায়। অপরদিকে, নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের পডজল মৃত্তিকার নিবিড় রাসায়নিক প্রক্রিয়ার পর কৃষিকাজ সম্ভব। এ সব অঞ্চলে কৃষিকাজের বাধ্যবাধকতা জনিত কারণে জনসংখ্যার বসত নিবিড় নয়। কানাডায় কর্দম মৃত্তিকা এবং পডজল মৃত্তিকা অঞ্চলের সীমারেখা জনসংখ্যা বিন্যাসকেও চিহ্নিত করেছে।

কেবল মৃত্তিকার ধরণই নয়, মৃত্তিকা গঠনও জনসংখ্যার বিন্যাসের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। যেখানে উপরি মৃত্তিকার ক্ষয় সাধন বেশী যেখানে ভূমি উর্বরতা সংরক্ষণ কষ্টসাধ্য এবং কৃষিকাজ সীমিত। এরূপ অঞ্চলে সাধারণত বিরল জনসংখ্যা বিন্যাস দেখা যায়। নিউজিল্যান্ডের ভূমি ক্ষয় এবং জনসংখ্যা বন্টনের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক লক্ষ্যণীয়।

জীব-জগতীয় প্রভাব: জনসংখ্যা বন্টনের সাথে গাছ-পালা এবং বিভিন্ন প্রানীর বিন্যাসধারার একটি যোগসূত্র রয়েছে। সেলভা, ক্যাম্পস, সাভানা, তুন্দ্রা, এবং তৈগা সমতল তৃণভূমি বিচিত্র মানব কর্মকান্ডের যেমন আধার তেমনি বৈচিত্র্যপূর্ণ জনসংখ্যা বিন্যাসও সৃষ্টি করেছে। অরণ্যভূমি, তৃণভূমি, কন্টকযুক্ত ঝোপ-ঝাড় ইত্যাদি প্রধানত: জনসংখ্যা বিস্তারের সহায়ক নয়। অপরদিকে, প্রেইরীভূমি আদি আমেরিকান এবং পরবর্তিতে গম চাষীদের জন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। একইভাবে আর্দ্র

নিরক্ষীয় অঞ্চল, আমাজান ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার স্বয়ংভোগী কৃষি, উপনিবিষ্ট কৃষি, কৃষিভিত্তিক জনসংখ্যার স্থিতি ঘটিয়েছে। এসব অঞ্চল এ ছাড়াও আদিবাসীদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জনসংখ্যা বন্টন দেখা যায়।

উপরোক্ত বিষয়াদি ছাড়া বিশ্ব জনসংখ্যা বন্টনে স্থানিক ও আঞ্চলিক রোগ-শোকের আক্রমণ ও প্রভাব, কৃষি ছাড়া অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য ও ঐতিহাসিকভাবে বিকশিত মানুষের আর্থনীতিক কর্মকান্ড ও ইহার পরিবর্তন এবং ঐতিহাসিক জনমিতিক (যেমন, অভিগমনের ক্ষেত্রে) এবং সামাজিক-রাজনৈতিক (যেমন, যুদ্ধ-বিগ্রহ) বিশেষ আঞ্চলিক জনসংখ্যার বন্টনকে সব সময়ে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করেছে।

জনসংখ্যার ঘনত্বঃ

জনসংখ্যার ঘনত্ব বলতে নির্দিষ্ট স্থান বা দেশে মানুষের সংঘবদ্ধ অবস্থানের নিবিড়তা বুঝায়। এই ঘনত্বের দ্বারা ভূমির উপর জনসংখ্যার চাপের মাত্রা প্রকাশ পেয়ে থাকে। কোন এলাকা বা দেশের আয়তন বা ক্ষেত্রফল দ্বারা মোট জনসংখ্যাকে ভাগ করে জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ণয় করা হয়। এই ঘনত্ব একর, বর্গ কি.মি. বা বর্গ মাইলে প্রতিফলিত হয়।

ছকে বর্ণিত পৃথিবীর অঞ্চলভিত্তিক জনসংখ্যা ঘনত্ব পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে,এই ঘনত্বের মধ্যে ব্যাপক তারতম্য রয়েছে। এই তারতম্য প্রধানত: ইতিপূর্বে বর্ণিত জনসংখ্যা বন্টনের উপাদানসমূহের সাথে ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কযুক্ত এবং এর সাথে অঞ্চল বা দেশের আয়তন ও জনসংখ্যা আকার সম্পর্কযুক্ত।

সারণী ৩.১.২: অঞ্চল ভিত্তিক বিশ্ব জনসংখ্যার ঘনত্ব, ২০১০

অঞ্চল ভিত্তিক বিশ্ব জনসংখ্যা ঘনত্ব, ২০১০ (জনসংখ্যা প্রতি বর্গ মাইল)			
দেশের নাম	**ঘনত্ব**	**দেশের নাম**	**ঘনত্ব**
সুইজারল্যান্ড	৬৮	চীন	১৪২
ফ্রান্স	৭৩	ভারত	৩৮৩
মাল্টা	১৬	বাংলাদেশ	১২২৯
যুক্তরাজ্য	২৫৪	সৌদি আরব	১১
যুক্তরাষ্ট্র	৩৩	ইসরাইল	২০৪
কানাডা	৭	আজারবাইজান	১০৫
ব্রাজিল	৭০	জাপান	৩৫০
আর্জেন্টিনা	১০৯	থাইল্যান্ড	১৩২
উরুগুয়ে	১৯	অস্ট্রেলিয়া	১০১
কলম্বিয়া	৪০	নিউজিল্যান্ড	১৬

উৎস : World Development Report 2010, Page-96

আয়তনে ছোট অথচ জনবহুল, এরূপ দেশের ঘনত্ব স্বভাবতই বেশী হয়। পক্ষান্তরে আয়তনে বড় কিন্তু জনবিরল দেশের ঘনত্ব কম হয়ে থাকে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে - জনবহুলতা কোন স্থানের জনসংখ্যার যে সমাবেশ বা পুঞ্জীভবনতা ঘটে তা প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক, জনমিতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উপাদানের উপর নির্ভর করে। সমতল উর্বর মৃত্তিকা, নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু, স্থল ও নৌপথে যাতায়াতের সুবিধা, শিল্প-গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল, রাজধানী ও নগর-বন্দরের অবস্থান প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে উত্তর গোলার্ধের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের বেশ কিছু দ্বীপ রাষ্ট্র ও দেশে, যেমন, হংকং (৬৩৯৬ জন/ব. কি. মি.), সিঙ্গাপুর (৭১৪৮ জন/ বর্গ কি.মি.), মাল্টা (১৩১৮ জন/বর্গ কি. মি.), বাংলাদেশ, (১২২৭ জন/বর্গ কি.মি.), বারবাডোস (৫৯৫ জন/বর্গ কি.মি., মালদ্বীপ (১০৩৭ জন/বর্গ কি. মি.), মরিশাশ, (৫৫০ জন/বর্গ . কি, মি.), নেদারল্যান্ডে (৪০১ জন/বর্গ. কি. মি.) জনসংখ্যার উচ্চ ঘনত্ব লক্ষ্য করা যায়। অপরদিকে, ঊষার মরুভুমি, বন্ধুর পার্বত্য এলাকা এবং তৃহিন মেরু অঞ্চলে বৃহদায়নিক রাষ্ট্রসমূহে যেমন, মঙ্গোঁলিয়া (১.৭ জন/বর্গ. কি. মি.), লিবিয়া (৩.৬ জন/ব. কি, মি), মৌরতানিয়া (৩.২ জন/বর্গ. কি. মি,), কানাডা (৩ জন/ বর্গ কি. মি,), অস্ট্রেলিয়া (১.০১ জন/বর্গ. কি. মি.), সৌদি আরব (১২ জন/বর্গ. কি. মি.), বলিভিয়া (৯ জন/বর্গ কি, মি.), নাইজার (১২ জন/বর্গ. কি. মি.) জনসংখ্যার ঘনত্ব অতি নিম্ন দেখা যায়।

পাঠসংক্ষেপ:

সামগ্রীকভাবে বিশ্বে জনসংখ্যা বন্টনের সাথে জনসংখ্যা ঘনত্বের প্যাটার্নের একটি সাধারণ সাদৃশ্য দেখা যায় (চিত্র ৩.১.১)। ইতিপূর্বে প্রদর্শিত মানিচিত্রেও জনসংখ্যা ঘনত্বের প্যাটার্ণ লক্ষ্য করা যাবে। তবে বিশ্ব পর্যায়ে বিভিন্ন দেশের মধ্যে ভূ-পরিবেশগত পার্থক্য এত বেশী এবং এদের মধ্যে জনসংখ্যা বিবর্তনের ইতিহাস ও ধারায় এমন পার্থক্য রয়েছে যে, বিভিন্ন দেশের মধ্যে জনসংখ্যার ঘনত্ব তথ্য তুলনায় যেতে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। অপরদিকে, আর্থনীতিক ও সামাজিক কারণে জনসংখ্যার ঘনত্ব তথ্যকে সম্পদের উপর জনসংখ্যা চাপের সূচক বলেও মনে করা উচিত নয়। এজন্য জনসংখ্যা ঘনত্ব তথ্য ব্যবহার উপযোগী হলেও যেমন, কৃষি জনসংখ্যা ঘনত্ব, পৌষ্টিক ঘনত্ব, জন-ভূমি অনুপাত, জনসংখ্যার অর্থনৈতিক ঘনত্ব, গৃহ বা খানা ভিত্তিক জনঘনত্ব, জনসংখ্যা বন্টনের কেন্দ্রীয় প্রবণতা, জনসংখ্যার পরিমিত, বিচ্যুতি, জনসংখ্যার সম্ভাব্যতা মান, জনসংখ্যা পুঞ্জীভবন, পরিমাপ ইত্যাদি পর্যালোচনা করা উচিত। আলোচ্য পাঠক্রম বহির্ভূত বলে এই বিষয়গুলি এখানে আলোচিত হল না।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৩.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. শূন্যস্থান পূরণ করুনঃ

১.১. বিকাশশীল দেশে সর্বাপেক্ষা জনবহুল দেশ হচ্ছে চীন এবং -----।

১.২. বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় মাত্র ---- শতাংশ লোক দক্ষিণ গোলার্ধে বাস করে।

১.৩. প্রায় ----- বিশ্ব জনসংখ্যা ২০°-৬০° উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে।

২. সত্য হলে 'স' মিথ্যা হলে 'মি' লিখুনঃ

২.১. জাতিসংঘের তথ্যানুযায়ী বর্তমানে পৃথিবীর জনসংখ্যা প্রায় ৬ বিলিয়ন।

২.২. জাতিসংঘের তথ্যানুযায়ী উন্নত দেশে প্রায় ৩ বিলিয়ন এবং বিকাশশীল দেশে ৪ বিলিয়ন জনসংখ্যা রয়েছে।

২.৩. জনসংখ্যা বন্টনের সাথে গাছ-পালা এবং বিভিন্ন প্রাণীর বিন্যাসধারার একটি যোগসূত্র রয়েছে।

২.৪. আয়তনে ছোট অথচ জনবহুল, এরূপ দেশের ঘনত্ব স্বভাবতই কম হয়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১. জনসংখ্যা কাকে বলে?

২. জনসংখ্যা বন্টনে প্রভাব বিস্তারকারী নিয়ামক সমূহ কি কি?

৩. জনসংখ্যার ঘনত্ব বলতে কি বুঝায়?

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. জনসংখ্যা কাকে বলে? জনসংখ্যা বিন্যাসের পার্থক্যসূচক উপাদানগুলি ব্যাখ্যা করুন।

২. জনসংখ্যার উলম্ব বিন্যাস পর্যালোচনা করুন।

৩. এই পাঠে অন্তর্ভুক্ত দুইটি তথ্য সারি অবলম্বনে জনসংখ্যা বিন্যাস ও ঘনত্বের বিভিন্নতা আলোচনা করুন।

পাঠ-৩.২ জনসংখ্যা পরিবর্তনের প্রক্রিয়াঃ প্রজননশীলতা

এই পাঠ শেষে আপনি-

- জনসংখ্যা পরিবর্তনের প্রক্রিয়া;
- প্রজননশীলতা;
- প্রজননশীলতার বিভিন্নতার কারণ; এবং
- প্রজননশীলতার বিশ্বধারা সম্পর্কে ধারনা লাভ করবেন।

কালীক পর্যায়ে জনসংখ্যার পরিমাণ বা সংখ্যাগত যে হ্রাস-বৃদ্ধি হয় তাকে জনসংখ্যা পরিবর্তন বলে। একটি দেশে বা জনগোষ্ঠীতে জনসংখ্যা পরিবর্তন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রথমত এই পরিবর্তন ধারা পর্যালোচনা করে জনমিতিক ক্ষয়পূরণ তথা ভারসাম্য নিরীক্ষণ করা যায়। একটি জনসংখ্যার মৃত্যু অথবা সদস্যদের বহির্গমনের ফলে একটি জনগোষ্ঠীর বা সমাজের ক্ষয় হয়, আবার জন্ম অথবা অন্তর্গমনের দ্বারা এই ক্ষয় পূরণ, এমন কি জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে। কাজেই জনসংখ্যা পরিবর্তন সাধনে তিনটি উপাদান গুরুত্বপূর্ণ:

(ক) জন্ম বা প্রজননশীলতা; (খ) মৃত্যু বা মরণশীলতা; এবং (গ) অভিগমন।

উপরোক্ত উপাদানসমূহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে ভারসাম্য থাকা প্রয়োজন। তবে তা বাস্তবে কদাচিৎ ঘটতে পারে। মাত্রাতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি যেমন ক্ষতিকর মাত্রাতিরিক্ত হ্রাসও তেমনি ক্ষতিকর। জনসংখ্যা হ্রাস পেলে শ্রমশক্তি হ্রাস পায়, ফলশ্রুতিতে আপেক্ষিক উৎপাদন প্রক্রিয়া ব্যাহত হতে পারে; এমন কি সমাজের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে। অনুরূপভাবে জন্ম হার হ্রাস-বৃদ্ধি সমাজে ভোগ ও চাহিদা বৃদ্ধি, অব্যবহৃত শ্রমিক বেকার সমস্যার সৃষ্টি, খাদ্যাভাব, কর্ম ও গৃহায়ন, সামাজিক সুবিধাদি এবং যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থার উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, জাতীয় সম্পদের উপর চাপ সৃষ্টি করে।

সাম্প্রতিক দশকে বাংলাদেশের জনসংখ্যার মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি দেশের উন্নয়ন গতিকে যথেষ্ট ব্যাহত করেছে এবং সামাজিক -অর্থনৈতিক অবকাঠামোর উপর যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করেছে। প্রায় বিকাশশীল দেশে এই পরিস্থিতি বিরাজ করছে বলা যায়। জনসংখ্যা পরিবর্তন পরিমাপ করার বেশ কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে। তবে সহজসাধ্য উপায় হলো দুইটি আদমশুমারীর মধ্যে জনসংখ্যার শতকরা পরিবর্তন লক্ষ্য করা। এর থেকে বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার নির্ণয় করা যায়। তবে এর থেকে জনসংখ্যা উপাদানসমূহের আপেক্ষিক ভূমিকা পরিমাপ করা যায় না। এজন্য পৃথকভাবে উপাদানসমূহ পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

প্রজননশীলতা

প্রজননশীলতা (Fertility) বলতে সজীব (Live) শিশু জন্মকে বুঝায়। সংশিষ্ট শব্দ 'প্রজনন ক্ষমতা' অর্থাৎ, শিশু জন্মদান ক্ষমতা (Fecundity) এবং 'প্রজননশীলতা' ভিন্নতর। প্রজননশীলতা প্রতি হাজার জনসংখ্যায় পরিমিত হয়। প্রজননশীলতা জনসংখ্যা পঠন-পাঠনের একটি প্রধান বিষয় কেননা, এটি মরণশীলতা এবং অভিগমনের চাইতে অধিক হারে ঘটে, ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান অনুঘটক। যেখানে মরনশীলতা ব্যক্তিকেন্দ্রিক অবশ্যম্ভাবী এবং অনিয়ন্ত্রিত, সেখানে প্রজননশীলতায় এগুলির কোনটি প্রযোজ্য নয় বরং কোনভাবেই স্থির বা অনুমানযোগ্য নয়। প্রজননশীলতাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং মনস্তাত্বিক নিয়ামক দ্বারা প্রভাবিত হয়। উপরন্তু,

মরণশীলতা যে কোন বয়সের জন্য প্রযোজ্য, কিন্তু প্রজননশীলতা কেবল নির্দিষ্ট বয়সসীমার মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ফলে, প্রজননশীলতার হারে মরণশীলতা অপেক্ষা অনেক সময় স্বল্পকালীন উত্থান-পতন দেখা যায়।

প্রজননশীলতা হারের হ্রাস-বৃদ্ধি অনেক সময় তথ্যের ঘাটতির জন্য ঘটতে পারে। জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সংক্রান্ত তথ্যও প্রায় দেশের জন্য ভ্রান্তিপূর্ণ। তবে জাতিসংঘের জনসংখ্যা বিভাগ এ সমস্ত ভ্রান্তি সংশোধনের জন্য উন্নত পদ্ধতি বের করেছে যা দ্বারা কোন দেশের প্রজননশীলতা হারের পরিসংখ্যান সংশোধন সম্ভব। অবৈধ সন্তান ধারণ বা জারজতা অনেক সময় প্রকৃত প্রজননশীলতা হারকে প্রভাবিত করতে পারে। এ ধরনের ভ্রান্তি মধ্য আমেরিকান দেশসমূহে প্রায় দেখা যায়।

প্রজননশীলতা বিভিন্নতার কারণ:

মানব জনসংখ্যায় সকল নারী সন্তান ধারণ এবং জন্মদান ক্ষমতা ও সংখ্যা সমরূপ নয়। অর্থাৎ প্রজননশীলতার দিক থেকে এদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। এর পেছনে কারণগুলো পরিবেশগত থেকে আর্থ-সামাজিক হয়ে থাকে। ফলে উন্নত বিশ্বে স্থূল জন্ম (Crude Birth Rate-CBR) প্রতিহাজার জনসংখ্যায় হার ১০ থেকে ১৫ জন কিন্তু বিকাশশীল দেশে এই হার ২৫ থেকে ৫০ হতে পারে। এই হারের দেশ ভিত্তিক পার্থক্য আরও ব্যাপক। আবার একই জনসংখ্যার বিভিন্ন শ্রেণীর (Subgroup/Sub-class) মধ্যেও প্রজননশীলতার তারতম্য হতে পারে। অনেকে মনে করেন যে, আবহাওয়া-জলবায়ু প্রজননশীলতার উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। বিষয়টি মারাত্মক ভ্রমাত্মক, কেননা একই জলবায়ু অঞ্চলের ইসরাইল এবং জর্ডান বা মিশরের স্থূল জন্মহারের মধ্যে মারাত্মক পার্থক্য রয়েছে। তেমনি দক্ষিণ এশিয় দেশসমূহের মধ্যেও এই হারের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান যুগে এই বিভিন্নতার কারণ প্রধানত: আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক। কোন জলবায়ুগত কারণের তেমন কোন ভূমিকা নেই বা এর কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

সারণী ৩.২.১: স্থূল জন্মহারের বিশ্ব আঞ্চলিক বিন্যাস, ২০১০

স্থূল জন্মহারের বিশ্ব আঞ্চলিক বিন্যাস, ২০১০			
সমগ্র বিশ্ব:	২৭	এশিয়া:	২৭
উন্নত অঞ্চল	১৫	পূর্ব এশিয়া	১৮
বিকাশশীল অঞ্চল	৩১	দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া	৩২
আফ্রিকা:	২৭	দক্ষিণ এশিয়া	৩৬
উত্তর আফ্রিকা	৪২	পশ্চিম এশিয়া	৩৮
পশ্চিম আফ্রিকা	৪৯	ওশানিয়া:	২১
ইউরোপ:	১৪	অস্ট্রেলিয়া	১৬
পূর্ব ইউরোপ	১৬	নিউজিল্যান্ড	১৬
উত্তর ইউরোপ	১৩	অন্যান্য	২৫
দক্ষিণ ইউরোপ	১৫	উত্তর আমেরিকা:	১৬
পশ্চিম ইউরোপ	১২	ল্যাটিন আমেরিকা:	৩২

উৎস: World Bank Report 2010.

নিচে প্রজননশীলতার অসমতার কতিপয় উল্লেখযোগ্য কারণ আলোচনা করা হল:

বৈবাহিক বৈশিষ্ট্য : বৈবাহিক অবস্থা বিশেষ করে বিবাহের বয়স, একাধিক বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কিত রীতিনীতি প্রজননশীলতার তারতম্যের অন্যতম কারণ। বিলম্বে বিবাহ নারীর প্রজননকালকে সংক্ষিপ্ত করে, ফলে জন্ম হার কম হয়। বিবাহ বিচ্ছেদের ফলেও প্রজননকাল সংক্ষিপ্ত হয়, ফলে প্রজননশীলতার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। পাশ্চাত্য দেশসমূহে দেরীতে বিবাহ, অর্থাৎ উচ্চ গড় বিবাহ বয়স এবং বিবাহিত জীবন ধারা, বিশেষ করে এ সময়ে জন্ম নিয়ন্ত্রণ উপকরণের উচ্চ হারের কারণে নিম্ন প্রজননশীলতা অবস্থা লক্ষ্য করা যায়। এ সমস্ত দেশে নারীর গড় বিবাহ বয়স প্রায় ২৫ বৎসর। পক্ষান্তরে, বিকাশশীল দেশে এই বয়স মাত্র ১৭ বৎসর। ফলে বিকাশশীল দেশে নারীদের দীর্ঘ প্রজননকাল অতিবাহিত হয় সন্তান ধারণে, যার কারণে এ সমস্ত দেশে উচ্চ জন্ম হার লক্ষ্য করা যায়।

শিক্ষাগত অবস্থা: শিক্ষা প্রজননশীলতার তারতম্যের ক্ষেত্রে অন্যতম একটি উপাদান। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীতে দেখা গেছে শিক্ষা ও প্রজননশীলতার মধ্যে নেতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে। শিক্ষার মান ও পর্যায় বৃদ্ধি পেলে প্রজননশীলতা হ্রাস পায়। অপরদিকে স্বল্প শিক্ষিত দেশে বা জনগোষ্ঠীতে বিপরীত সম্পর্ক দেখা যায়। উচ্চ-শিক্ষিত নারীরা শিক্ষার প্রয়োজনের স্বার্থে বিবাহ অবস্থা বিলম্বিত করেন এবং অথবা বিবাহিতগণ সন্তান ধারন বিলম্বিত করেন এবং বিবাহিত জীবনে সন্তান ধারণে স্বীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। ফলে, প্রজননশীলতা প্রভাবিত হয়। এই পরিস্থিতি উন্নত ও বিকাশশীল উভয় বিশ্বে দৃশ্যমান। এ কারণে জন্ম হার হ্রাসকরণের ক্ষেত্রে অনেক দেশে সামগ্রিক শিক্ষা অবস্থা, বিশেষ করে নারী শিক্ষার উন্নতির উপর সাম্প্রতিককালে গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

পেশা: পেশাগত পার্থক্যের জন্যও প্রজননশীলতার বিশেষ তারতম্য হয়ে থাকে। সাধারণভাবে প্রাথমিক পর্যায়ের কর্মকান্ডে নিয়োজিত এবং নিম্নহারের একটি ভূমিকা কার্যকর থাকতে পারে। অপরদিকে, মাধ্যমিক ও তৃতীয় পর্যায়ের কর্মকান্ডে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর, যাদের মধ্যে শিক্ষার হার বেশী, অর্থাৎ পেশাজীবীদের মধ্যে নিম্ন জন্ম হার দেখা যায়। পেশার এই প্রভাব পাশ্চাত্যে নিম্ন জন্মহারের জন্য বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। অপরদিকে, পেশাজীবী নারীদের মধ্যে সীমিত পরিবার সৃষ্টির লক্ষ্যে নিম্ন জন্ম হার লক্ষণীয়। এক্ষেত্রে নারীর চাকুরীর দায়িত্ব পালন এবং সন্তান ধারণ ও লালন-পালন একটি বিপরীতধর্মী সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে - যার প্রভাব নারীদের নিম্ন প্রজননশীলতার মাধ্যমে প্রতিভাত হয়। উন্নত ও বিকাশশীল উভয় ধরনের দেশে এই পরিস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

আবাসিকতা: গ্রাম ও শহরে আবাসিকতা ও প্রজননশীলতার মধ্যে সুষ্পষ্ট বিপরীত সম্পর্ক রয়েছে। পল্লী এলাকার চাইতে শহর এলাকায় প্রজনন হার কম দেখা যায়। বাংলাদেশে বিবাহিত নারীর জীবিত সন্তান জন্মদানের গড় সংখ্যা (২০১০) শহর এলাকায় ৩.৪ এবং পল্লী এলাকায় ৩.৯ ছিল। উন্নত বিশ্বে এই পার্থক্য আরও ব্যাপক। আবাসিকতা অনুযায়ী প্রজননশীলতার পার্থক্য প্রধানত জনগোষ্ঠীর শিক্ষা ও পেশাগত কাঠামোর সাথে সম্পর্কযুক্ত। এছাড়াও শহরাঞ্চলে উচ্চ লিঙ্গ-হার, আবাসিক সমস্যা, অভিগমনে বয়স ও লিঙ্গ ভিত্তিক প্রবণতা ইত্যাদি পরিস্থিতিতে, বিশেষ করে বিকাশশীল দেশসমূহের নগরগুলিতে নারীগণ কম হারে বসবাস করে এবং অনেক পরিবার সন্তানদের পল্লী অঞ্চলে রেখে আসে। এহেন পরিস্থিতি স্বাভাবিকভাবে নিম্ন প্রজননশীলতা ও নিম্ন জন্মহারের সৃষ্টি করে।

ধর্মীয় কাঠামো : প্রজননশীলতার তারতম্যে কোন কোন দেশের ধর্মীয় কাঠামোর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। অনেক ধর্মে বিবাহিত অবস্থাকে উৎসাহিত করা হয়। আবার কোন কোন ধর্মে জন্মনিয়ন্ত্রণকে পাপ বলে পরিগণিত হয়। এ সমস্ত ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির কারণে মুসলমান, ক্যাথলিক খৃষ্টান এবং ইহুদীদের মধ্যে উচ্চ

প্রজননশীলতা লক্ষ্য করা যায়। এমন কি ইউরোপের ক্যাথলিক অধ্যুষিত ইতালী, গ্রীস ও স্পেনে অন্যান্য প্রতিবেশী দেশের তুলনায় উচ্চ জন্ম হার দেখা যায়। দক্ষিণ এশিয়ায় হিন্দুদের মধ্যে বিধবা বিবাহ নিরুৎসাহ করার সংস্কৃতি থাকায় এবং অপরদিকে মুসলমানদের মধ্যে এদের পুনর্বিবাহ প্রচলিত থাকায় মুসলমানদের মধ্যে হিন্দু অপেক্ষা উচ্চ জন্ম হার লক্ষ্য করা যায়।

উপরোক্ত প্রধান নিয়ামকসমূহ ব্যতীত সমষ্টিগতভাবে একটি দেশের বয়-লিঙ্গ কাঠামো, লিঙ্গ ও বয়স ভেদে মরণশীলতা,পরিবার কাঠামো সম্পর্কীয় সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সাম্প্রতিককালে শিশু মৃত্যু হারের ক্রমাবনতি, মাতৃ মৃত্যুর হ্রাস, নারীর অবস্থানের প্রতি পরিবর্তিত সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, নারীর সন্তান ধারণ এবং পারিবারিক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্রম বর্ধমান ক্ষমতা এবং জন্ম নিয়ন্ত্রণ উপকরণের ব্যাপক ব্যবহার প্রজননশীলতার উপর নেতিবাচক প্রভাব বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এই সমস্ত অবস্থার অনেকগুলিই সম্প্রতি বিকাশশীল দেশে কার্যকর দেখা গেছে। এ সমস্তের ফলশ্রুতিতে বিশ্বের প্রায় সকল দেশে জন্মহারের উল্লেখযোগ্য হ্রাস ঘটেছে।

প্রজননশীলতার বিশ্বধারা

স্থান ও কাল হিসেবে বিশ্বব্যাপী প্রজননশীলতার পার্থক্য রয়েছে। জন্ম হার সর্বনিম্ন প্রতি হাজারে ৪০ থেকে ২৪০ (১০-৪৯ বয়-সীমায়) হতে পারে। সর্বোচ্চ প্রজননশীলতা (জন্ম হার প্রতি হাজারে ৪০-এর উপরে) এবং প্রজনন হার ১২০-এর বেশী ল্যাটিন আমেরিকার অধিকাংশ দেশে, আফ্রিকা, পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় দেখা যায়। শিশু ও যুবা বয়সে উচ্চ মৃত্যু হার এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী মনে করা হয়। ল্যাটিন আমেরিকার দেশসমূহে দ্রুত হ্রাসপ্রাপ্ত মৃত্যু হার, অভিবাসন উচ্চ জন্মহারের প্রধান কারণ। অপরদিকে, এশিয়ার ব্যাপক অঞ্চলে উচ্চ জন্ম হার অতি উচ্চ জনসংখ্যা বন্টন ও ঘনত্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এ সমস্ত অঞ্চলে নিম্ন শিক্ষাহার, কৃষিভত্তিক পেশা কাঠামো, ধর্মীয় সংস্কার উচ্চ প্রজননশীলতার পেছনে কার্যকর। বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয় যে, বিশ্বের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ জনসংখ্যা, যারা প্রধানত: বিকাশশীল দেশে বাস করে সেখানে স্থূল জন্ম হার ৪০-এরও বেশী। অপরদিকে, নিম্ন প্রজননশীলতা সম্পন্ন উন্নত বিশ্বে, প্রধানত: ইউরোপে স্থূল জন্ম হার ১৫-এরও নিচে।

সারণী ৩.২.২: স্থূল মৃত্যু হারের বিশ্ব আঞ্চলিক বিন্যাস, ২০১০

স্থূল মৃত্যুহারের বিশ্ব আঞ্চলিক বিন্যাস, ২০১০					
বিশ্ব:	২৪	মধ্য আফ্রিকা	৪৬	ইউরোপ:	১১
উন্নত বিশ্ব	১২	দক্ষিণ আফ্রিকা	২৫	উত্তর ইউরোপ	১৩
বিকাশশীল বিশ্ব	২৮	এশিয়া:	২৪	পশ্চিম ইউরোপ	১১
আফ্রিকা:	৪১	পশ্চিম এশিয়া	৩১	পূর্ব ইউরোপ	১০
উপ-সাহারা	৪৪	দক্ষিণ এশিয়া	৩১	দক্ষিণ ইউরোপ	১১
উত্তর আফ্রিকা	৩২	দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া	২৬	উত্তর আমেরিকা	২৬
পশ্চিম আফ্রিকা	৪৫	পূর্ব এশিয়া	১৭	ল্যাটিন আমেরিকা মধ্য আমেরিকা	২৬ ২৯
পূর্ব আফ্রিকা	৪৬	ওসানিয়া	১৯	ক্যারিবীয় অঞ্চল	২৩

পাঁচ থেকে সাত দশকে পূর্বে নিম্ন প্রজননহার প্রধানত: পশ্চিম ইউরোপে, বিশেষ করে, স্ক্যান্ডিনেভিয় দেশসমূহের বৈশিষ্ট্য ছিল। বর্তমানে প্রায় সকল মধ্য এবং পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহে অতি নিম্ন প্রজননশীলতা দেখা যায়। তবে ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক কারণে আলবেনিয়া (৩৫), আইসল্যান্ড (২৩), পর্তুগাল (২৩), সার্বিয়া (২৩) এবং আয়ারল্যান্ডে (২০) ইউরোপীয় মাপকাঠিতে উচ্চ প্রজননশীলতা দেখা যায়। সর্বনিম্ন প্রজননশীলতার জন্য (১২-এর নিচে) জার্মানী, হাঙ্গেরী, সুইডেন, চেকোশ্লোভাকিয়া, অষ্ট্রিয়া এবং সুইজারল্যান্ড বিখ্যাত।

এশীয় দেশসমূহের মধ্যে নিম্ন প্রজননশীলতার জন্য জাপান (১২-এর নিচে) উল্লেখযোগ্য। মধ্যম মাত্রার (১৫-৩০) প্রজননশীলতা হংকং, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা এবং বাংলাদেশে দেখা যায়। অপরদিকে অবশিষ্ট দেশসমূহে এখনও উচ্চ প্রজননশীলতা বিরাজ করছে। পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার দেশসমূহে উচ্চ প্রজননশীলতার জন্য বিখ্যাত। সাম্প্রতিককালে রাষ্ট্রীয় আইনের আওতায় চীনে প্রজননশীলতার অতি দ্রুত হ্রাস বিশেষ উল্লেখ্য। মধ্যম পর্যায়ের প্রজননশীলতা উত্তর আমেরিকা, ল্যাটিন আমেরিকার দক্ষিণ ভাগের দেশসমূহ, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডে দেখা যায়। মধ্য আমেরিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশসমূহ এখনো উচ্চ প্রজননশীলতা বিরাজ করছে।

উপরের পর্যালোচনা থেকে আমরা প্রজননশীলতার নিম্নোক্ত পাঁচটি বিশ্বধারা লক্ষ্য করতে পারি।

(ক) ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকা এবং এশিয়ার অধিকাংশে বা বেশিরভাগ দেশসমূহে অতি উচ্চ প্রজননশীলতা;

(খ) বেশ কিছু বিকাশশীল দেশে উচ্চ প্রজননশীলতা;

(গ) বেশ কিছু বিকাশশীল দেশে দীর্ঘ মেয়াদী এবং শ্লথ প্রজননশীলতা হ্রাস;

(ঘ) কিছু উন্নত দেশে সম্প্রতি মধ্যম ও সামান্য উচ্চ প্রজননশীলতা পরিস্থিতি; এবং

(ঙ) কিছু দেশে, বিশেষ করে উত্তর ও মধ্য ইউরোপে স্থিতিশীল প্রজননশীলতা।

পাঠসংক্ষেপ:

কালীক পর্যায়ে জনসংখ্যার পরিমাণ বা সংখ্যাগত যে হ্রাস-বৃদ্ধি হয় তাকে জনসংখ্যা পরিবর্তন বলে। একটি দেশে বা জনগোষ্ঠীতে জনসংখ্যা পরিবর্তন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

জনসংখ্যা পরিবর্তন সাধনে তিনটি উপাদান গুরুত্বপূর্ণ:

(ক) জন্ম বা প্রজননশীলতা; (খ) মৃত্যু বা মরণশীলতা; এবং (গ) অভিগমন।

এই পাঠে উপরোক্ত তিনটি উপাদানের মধ্যে জন্ম বা প্রজননশীলতা নিয়ে আলোচনা করেছি। প্রজননশীলতা (Fertility) বলতে সজীব (Live) শিশু জন্মকে বুঝায়। প্রজননশীলতার বিভিন্নতার কারণসমূহ হচ্ছে- বৈবাহিক বৈশিষ্ট্য, শিক্ষাগত অবস্থা, পেশা, আবাসিকতা, ধর্মীয় কাঠামো প্রভৃতি। এছাড়া প্রজননশীলতা বিশ্ব ধারা সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছি। স্থান ও কাল হিসেবে বিশ্বব্যাপী প্রজননশীলতার পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ৩.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. শূন্যস্থান পূরণ করুনঃ

১.১. ----- পর্যায়ে জনসংখ্যার পরিমাণ বা সংখ্যাগত যে হ্রাস-বৃদ্ধি হয় তাকে জনসংখ্যা পরিবর্তন বলে।

১.২. প্রজননশীলতা প্রতি ----- জনসংখ্যায় পরিমিত হয়।

১.৩. উন্নত বিশ্বে স্থূল জন্ম প্রতিহাজার জনসংখ্যায় হার ----- থেকে ১৫ জন কিন্তু বিকাশশীল দেশে এই হার ২৫ থেকে ----- হতে পারে।

২. সত্য হলে 'স' মিথ্যা হলে 'মি' লিখুনঃ

২.১. একই জলবায়ু অঞ্চলের ইসরাইল এবং জর্ডান বা মিশরের স্থূল জন্মহারের মধ্যে মারাত্মক পার্থক্য রয়েছে।

২.২. বিলম্বে বিবাহ নারীর প্রজননকালকে সংক্ষিপ্ত করে, ফলে জন্ম হার বেশী হয়।

২.৩. বিবাহ বিচ্ছেদের ফলেও প্রজননকাল সংক্ষিপ্ত হয়।

২.৪. বাংলাদেশে বিবাহিত নারীর জীবিত সন্তান জন্মদানের গড় সংখ্যা (২০১০) শহর এলাকায় ৩.৪ এবং পল্লী এলাকায় ৩.৯ ছিল।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১. জনসংখ্যা পরিবর্তন বলতে কি বুঝায়? এর মূল উপাদানগুলি কি?

২. প্রজননশীলতা বলতে কি বুঝায়? প্রজননশীলতা এবং প্রজননক্ষমতার পার্থক্যকরণ করুন।

৩. প্রজননশীলতার বিভিন্নতার প্রধান কারণগুলি কি কি?

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. জনসংখ্যা পরিবর্তন বলতে কি বুঝায়? প্রজননশীলতার বিশ্ব বিন্যাস ধারা আলোচনা করুন।

২. প্রজননশীলতা বলতে কি বুঝায়? প্রজননশীলতার বিভিন্নতার প্রধান কারণগুলি ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ-৩.৩ জনসংখ্যা পরিবর্তনের প্রক্রিয়াঃ মরণশীলতা

এই পাঠ শেষে আপনি-

- জনসংখ্যা পরিবর্তনের প্রক্রিয়া- মরণশীলতা;
- মরণশীলতার কারণ;
- মরনশীলতার বিশ্বধারা; এবং
- মরণশীলতার বিভিন্নতা সম্পর্কে ধারনা লাভ করবেন।

জীবজগতের যে কোন সদস্যের মত মানুষ মরণশীল। জন্মে যে জীবন শুরু মৃত্যুতে তার আমোঘ পরিসমাপ্তি। মানুষের মৃত্যু হলেও সমাজ মরণশীল নয়; কেননা মৃত্যুর ফলে সমাজের যে ক্ষয় তা জন্মের মাধ্যমে পূরণ হয়। প্রকৃতপক্ষে, প্রজননশীলতা ও মরণশীলতা সমাজে সংখ্যাগত ভারসাম্য রক্ষা করে। তবে মরণশীলতা পরোক্ষভাবে প্রজননশীলতাকেও প্রভাবিত করতে পারে। বিশ্বের বিকাশশীল অঞ্চলের উচ্চ প্রজননশীলতার উপর শিশু মৃত্যুহারের বিশেষ প্রভাব রয়েছে।

মরণশীলতা জনসংখ্যার বৃদ্ধি প্রক্রিয়াকেই শুধু প্রভাবিত করে না, সামাজিক-আর্থনীতিক বিকাশের প্রক্রিয়াকেও প্রভাবিত করতে পারে। উচ্চ মৃত্যু হার জনসংখ্যা কাঠামো বিভিন্ন অংশ যেমন, সামাজিক কাঠামো, বয়-কাঠামো, বিবাহ-কাঠামো, এবং আর্থনীতিক কাঠামো বিশেষ করে শ্রম শক্তি সরবরাহকে প্রভাবিত করে থাকে।

মৃত্যু সাধারণত: একটি জনসংখ্যার সদস্যদের বার্ধক্য জনিত অথবা ব্যাধি জনিত কারণে ঘটে থাকে। জনসংখ্যার এই মৃত্যু প্রবণতাকে মরণশীলতা (Mortality) বলে। প্রজননশীলতার মত মরণশীলতাও প্রতি হাজার জনসংখ্যায় সাধারণত: নির্মিত হয়। মৃত্যুকে নিয়ন্ত্রণ জন্ম নিয়ন্ত্রণের চাইতে মানব সমাজে অধিকতর গ্রহণীয়। যার ফলে বিশ্বব্যাপী রোগ-শোক হ্রাসের প্রচেষ্টা ও প্রবণতা সভ্যতার শুরু থেকে গুরুত্বলাভ করেছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতিই এর প্রতিফলন। বিশ্বের অঞ্চল বিশেষে প্রজননশীলতা হ্রাসের চাইতে মরণশীলতা হ্রাসের ব্যাপকতা সহজে ও দ্রুত ঘটেছে। এর প্রতিফলন ঘটেছে বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষের আয়ুষ্কাল (Longivity) বৃদ্ধিতে। মরণশীলতার দ্রুত হ্রাস এবং আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি বিশ্বের অঞ্চল বিশেষে 'জনসংখ্যা বিস্ফোরণ' এর জন্য দায়ী। এ কারণে ভূগোলবিদগণ জনসংখ্যার মরণশীলতার বিন্যাসের প্রতি বিশেষ আগ্রহী।

সারণী ৩.৩.১: নির্বাচিত দেশসমূহের গড় আয়ুষ্কাল, ২০১০

নির্বাচিত দেশসমূহের জনসংখ্যার গড় আয়ুষ্কাল ২০১০	
দেশ	**গড় আয়ু (বৎসর)**
বাংলাদেশ	৬৬.৯
শ্রীলঙ্কা	৭৪.৪
ভুটান	৬৫.৭
মালদ্বীপ	৭২.৩
পাকিস্তান	৬৭.২
ভারত	৬৪.৪
নেপাল	৬৭.৫
জাপান	৮৩.২
যুক্তরাষ্ট্র	৭৯.৬
চীন	৭৩.৫
ব্রাজিল	৭২.৯
আফগানিস্তান	৪৪.৬

উৎস : World Bank Development Report 2010

জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী বিশ্বে শিশুর

জন্মকালীন প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল প্রায় ৬০ বৎসর। উন্নত ও বিকাশশীল দেশে এই হার যথাক্রমে ৭৫ এবং ৫৭ বৎসর। দক্ষিণ এশিয়ার এই আয়ুষ্কাল ৫৫ বৎসর এবং বাংলাদেশে ৫৮ বৎসর। জাপানে জন্মকালীন প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল ৮০ বৎসর। ইউরোপীয় দেশসমূহে এই বয়স ৭৫ থেকে ৭৮। আফ্রিকার দেশসমূহে জন্মকালীন প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল অপেক্ষাকৃত কম ৩০ থেকে ৫০ বৎসর।

মরণশীলতার কারণঃ

মরনশীলতার বিভিন্ন পরিমাপকে বিশ্বধারা এবং জন্মলগ্নে প্রত্যাশিত আয়ুষ্কালের বিশ্বব্যাপী বিভিন্নতা থেকে অনুধাবন করা যায় যে পরিণত বয়সে অসুখ-বিসুখে মৃত্যু অর্থাৎ স্বাভাবিক মৃত্যু ছাড়াও অনেক মানুষ পরিণত বয়সের পূর্বেই মারা যান। একে অকাল মৃত্যু বলা হয়। বিশ্বে অস্বাভাবিক বা অকাল মৃত্যুর প্রধান কারণগুলি এখন সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

হৃদযন্ত্র এবং কিডনী সংক্রান্ত জটিলতাঃ যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, উত্তর-পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহের মোট মৃত্যুর ৫০ শতাংশ হৃদযন্ত্র এবং কিডনী ও মূত্রাশয় সংক্রান্ত রোগের কারণে ঘটে থাকে। এই কারণদ্বয় ভূ-মধ্যসাগরীয় ইউরোপ, জাপান, চীনে ৩০ শতাংশ এবং বিকাশশীল দেশসমূহে ১০ শতাংশ মৃত্যুর জন্য দায়ী। এই হার গত ৫০ বৎসরে বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে নাই বরং যুক্তরাষ্ট্রে এই হারের ঊর্ধ্বগতি লক্ষ্য করা গেছে।

ক্যান্সার: ক্যান্সার যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের মোট মৃত্যুর ১৭ শতাংশ, স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশসমূহ, বেলজিয়াম, সুইজারল্যান্ড এবং জার্মানীর ২০ শতাংশ ঘটে থাকে। তবে উন্নতর রোগ চিহ্নিতকরণ এবং চিকিৎসার সুযোগ ও ব্যবস্থাপনার জন্য ক্যান্সারের ফলে মৃত্যুর হার কিছুটা নিম্নগামী হয়েছে।

বহুমূত্র : যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিম ইউরোপে বহুমূত্র রোগ মোট মৃত্যুর ২ শতাংশ ঘটিয়ে থাকে। পাশ্চাত্যের অন্যান্য দেশে ১ থেকে ২ শতাংশ মৃত্যু এই কারণে ঘটে। বিকাশশীল দেশে মোট মৃত্যুর ১ শতাংশেরও কম বহুমূত্র জনিত। গত প্রায় ৫০ বৎসরে এই ধারা অপরিবর্তিত রয়েছে।

যক্ষ্মা : যক্ষ্মা স্পেনে মোট মৃত্যুর ৩ শতাংশ, পর্তুগালে ৪ শতাংশ এবং বিকাশশীল দেশে ৫ থেকে ৬ শতাংশ ঘটিয়ে থাকে। আফ্রিকায় এই হার অপেক্ষাকৃত উচ্চ। তবে, সাম্প্রতিক দশকে উন্নতর চিকিৎসা ব্যবস্থার কারণে যক্ষ্মাজনিত মৃত্যু হার অতি দ্রুত কমছে।

যকৃত প্রদাহ : যকৃত প্রদাহ ফ্রান্সের ৭ম, সুইজারল্যান্ড, জার্মানী, পর্তুগাল, ইটালী এবং রাশিয়ায় ৯ম, যুক্তরাষ্ট্র ১০ম এবং বিকাশশীল দেশসমূহে ২০ তম প্রধান মৃত্যুর কারণরূপে চিহ্নিত। মদ উৎপাদন ও মাদকাসক্তির সাথে এই মৃত্যু ধারার সম্পর্ক রয়েছে। বর্তমান বিশ্বে, বিশেষ করে রাশিয়ায় ও পশ্চিম ইউরোপে যকৃত প্রদাহ জনিত মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আত্মহননঃ পশ্চিমা বিশ্বে বস্তুবাদ নির্ভর সংস্কৃতি, কর্মস্থলে প্রতিযোগিতা, মানসিক চাপ এবং বিবিধ সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে আত্মহত্যা একটি গুরুত্বপূর্ণ মৃত্যুর কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। সুইজারল্যান্ড, ডেনমার্ক এবং সুইডেন ৬ষ্ঠ, জার্মানী ও ফিনল্যান্ড, কানাডা এবং বেলজিয়ামে ১০ম এবং বিকাশশীল বিশ্বে ২২তম প্রধান মৃত্যুর কারণ হলো আত্মহত্যা। ইদানিংকালে বিশ্বে এই ধারার তেমন কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না।

দুর্ঘটনা এবং দুর্যোগ : বিশ্বে বিশেষ করে পাশ্চাত্যদেশে মটরগাড়ী ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে দুর্ঘটনা মৃত্যুর ৪র্থ প্রধান কারণ। এই ধরনের দুর্ঘটনা বিকাশশীল বিশ্বে কম। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ জনিত দুর্ঘটনায় বিশেষ করে বিকাশশীল দেশে হঠাৎ প্রচুর মৃত্যু ঘটে থাকে। এই মৃত্যু প্রধানত: বন্যা, নদীভাঙ্গন, ঘূর্নিঝড় ও উপকূলীয় ঝড়, ভূমিকম্প ইত্যাদি কারণে ঘটে থাকে। আর্দ্র নিরক্ষীয় অঞ্চলে এই ধরনের প্রাকৃতিক দূর্ঘটনার প্রবণতা বেশী।

১৯৭০ সালে ১২ নভেম্বর বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণি ঝড়ের ফল ৫০,০০০ লোকের মৃত্যু ঘটে। ১৯৮৫ সালের মে মাসে অনুরূপ দুর্যোগে ১৫,০০০ লোক প্রাণ হারায়। ১৯৯২ সালের উপকূলীয় ঝড়ে প্রায় ১০,০০০ লোক মারা যায়।

দূষণঃ অধুনা বিশ্বে বিশেষত: পরিবেশ দূষণের দীর্ঘ মেয়াদী প্রতিক্রিয়া একাধিক রোগাক্রান্ততার কারণ। দূষণ জনিত কারণে উপরে বর্নিত ক,খ এবং ঘ রোগের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে করা হয়। তেজস্ক্রীয় বিকিরণজনিত কারণে রাশিয়া চীন, জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রে নানাবিধ শারীরিক ও স্নায়ুবিক রোগের বৃদ্ধি ঘটেছে। বিকাশশীল দেশেও দূষণ জনিত রোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উপরোক্ত কারণ ছাড়াও বিশেষ করে বিকাশশীল দেশে সাম্প্রতিক দশকে ম্যালিরিয়া, টাইফয়েড, সন্তান ধারণজনিত সমস্যা (মাতৃমৃত্যুর প্রধান কারণ) শ্বাসযন্ত্র সংক্রান্ত রোগ, ডাইরিয়া, আমাশয় এবং দীর্ঘস্থায়ী অপুষ্টি জনিত অবস্থা মৃত্যুর উল্লেখযোগ্য কারণ। অপরদিকে উন্নত ও বিকাশশীল উভয় বিশ্বে যুদ্ধের কারণে প্রচুর লোক হতাহত হয়ে চলেছে। বর্তমানে আফগানিস্তান, ইরাক, কসভো, মধ্য আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে যুদ্ধজনিত কারণে মৃত্যুর ঘটনা প্রতিটি দেশে লক্ষ পর্যায় ছাড়িয়ে গেছে। এ সমস্ত যুদ্ধে স্থানীয়

খাদ্যাভাব ও অপুষ্টি অধিকভাবে শিশু মৃত্যুও ঘটিয়ে থাকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ইউরোপে মৃত্যু হার প্রতি হাজারে ৫০ ছাড়িয়ে যায় এবং মোট মৃত্যু সংখ্যা প্রায় ১১ মিলিয়নে দাঁড়ায়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাকিবাহিনীর হাতে ৩ মিলিয়ন লোক নিহত হয়।

এতদসত্ত্বেও বেশ কিছু নতুন রোগ, যেমন, এইডস্ বিশ্ব মরণশীলতার বর্তমান ধারাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে।

মরণশীলতার বিশ্বধারা

উপরের আলোচনায় দেখা যায় যে, উন্নত বিশ্বে বিশেষ কিছু রোগ মৃত্যুর প্রধান কারণ। কিন্তু বিকাশশীল দেশে এগুলি ছাড়াও বেশ কিছু সংক্রামক রোগ মৃত্যু ঘটিয়ে থাকে। এই সামগ্রিক চিত্রের পটভূমিকায় মরণশীলতার বিশ্বব্যাপী বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। এর প্রধান কারণ :

সাম্প্রতিক দশকে চিকিৎসা প্রযুক্তির উন্নতি ও বিস্তার;

ব্যক্তিগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে চিকিৎসা ব্যবস্থাপনার উন্নতি;

কতিপয় ক্ষতিকর রোগাক্রান্ত অবস্থার নিয়ন্ত্রণ (যেমন, টি. বি, কলেরা, গুটি বসন্ত ইত্যাদি);

রোগ চিহ্নিতকরণ ব্যবস্থার উন্নতি এবং তদানুযায়ী চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা;

নবজাতক ও শিশু মৃত্যুহারের অতিদ্রুত নিম্নগতি; এবং

আন্তর্জাতিক সহায়তামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রচেষ্টায় মহামারী এবং দুর্ভিক্ষের সফল নিয়ন্ত্রণ।

এতদসত্ত্বেও বিশ্বের গড় স্থূল মৃত্যু হার (Crude Death Rate-CDR) প্রতি হাজারে প্রায় ১৭ জন। এই হার বিশ্ব গড় জন্ম হারের প্রায় অর্ধেকের কাছাকাছি। বিশ্ব গড় মাত্রার উপরে মৃত্যু হারযুক্ত দেশসমূহ প্রধানত: দক্ষিণ এশিয়া, আফ্রিকা এবং মধ্য ও ল্যাটিন আমেরিকার অংশ বিশেষে (আর্জেন্টিনা, চিলি, ভেনেজুয়েলা এবং উরুগুয়ে ব্যতীত)। এ সমস্ত দেশে উচ্চ মৃত্যুহারের কারণ প্রধানত: অতি উচ্চ নবজাতক ও শিশু মৃত্যু হার (১০০ থেকে ২০০ প্রতি হাজারে) এবং নিম্ন আয়ুষ্কাল (৩০ থেকে ৫০ বৎসর)। এ পরিস্থিতির মূলে রয়েছে প্রধানত: নিম্ন জীবনযাত্রা মান, সীমিত স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা এবং নিম্ন স্বাস্থ্য পরিবেশ।

উচ্চ জীবনযাত্রা মান সত্ত্বেও পশ্চিম ইউরোপের কিছু দেশে নবজাতক ও শিশু মৃত্যুহার প্রতি হাজারে ৩০-এর নিচে,আয়ুষ্কাল প্রায় ৭০ বৎসর এবং মৃত্যু হার ১০ থেকে ১২। এই নিম্নহার প্রধানত: বৃদ্ধ জনসংখ্যার আধিক্যের কারণেও প্রভাবিত হয়েছে। স্ক্যান্ডিনেভিয় দেশসমূহ নেদারল্যান্ড এবং আরও কয়েকটি দেশে অতি নিম্ন শিশু মৃত্যু হার, উচ্চ আয়ুষ্কাল এবং স্বাস্থ্য সেবার অতি উচ্চ মানের কারণে মৃত্যু হার ১০-এর নিচে দেখা যায়। এ ধরনের মৃত্যু হার কিছু পূর্ব ও দক্ষিণ ইউরোপীয় দেশসমূহে যুবা বয় কাঠামোর কারণে দেখা যায়। এ ধরনের বিভিন্নতা সত্ত্বেও ইউরোপের প্রায় সর্বত্র মৃত্যুহারের মাত্রা জন্মহারের নিচে অবস্থান করছে।

অপরদিকে, যুবা বয়:কাঠামো, উচ্চ জীবন যাত্রা মান এবং প্রজননশীলতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা ধারা অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র। কানাডা এবং রাশিয়ার নিম্ন মৃত্যু হারকে প্রভাবিত করেছে। সম্প্রতি জাপান, আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে এবং কিছু ল্যাটিন আমেরিকার দেশে এই ধারা অনুসরণ করছে। সম্পদের উপর চাপ, উচ্চ জীবনযাত্রা মান, নিম্ন প্রজননশীলতা এবং মান সম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা দ্বারা বেশ কিছু ক্ষুদ্র দেশের নিম্ন মৃত্যু হার প্রভাবিত হয়েছে। এগুলি হলো : বার্মুদা (৬), পুর্টোরিকো (৬), আইসল্যান্ড (৬),

তাইওয়ান (৬), হংকং (৫), এবং সিঙ্গাঁপুর (৫)। এ সমস্ত দেশে অতি নিম্ন জন্ম ও মৃত্যু হার জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধিহারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।

মরণশীলতার বিভিন্নতা: স্মর্তব্য যে, মরণশীলতার উপরোক্ত ধারার মধ্যে যথেষ্ট আভ্যন্তরীণ বিভিন্নতা রয়েছে। এই বিভিন্নতা বিশেষভাবে প্রকট বয়স এবং নারী-পুরুষ অনুযায়ী। সাধারণভাবে ১ বৎসরের কম বয়স্ক শিশু এবং ৬০ বা ৬৫ বৎসরের উপরে বয়স্ক জনগোষ্ঠীর মৃত্যু হার বেশী হয়ে থাকে। নিম্ন বয়স-সীমায় শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সীমিত থাকে। শিশুদের জন্ম সংক্রান্ত বিভিন্ন সঙ্কট বা রোগ, বৃদ্ধদের রোগাক্রান্ততা হওয়ার প্রবণতা এর জন্য দায়ী।

৫-২৫ বৎসরের এবং কোন কোন দেশে ৫-২৪ বৎসরের মধ্যে মৃত্যু হার সবচেয়ে কম হয়ে থাকে। অপরদিকে, শিশু বয়সে পুরুষ শিশুদের ৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত শারীরিক গঠনগত কারণে মৃত্যু প্রবণতা বেশী থাকে। এই বয়সে নারী শিশুদের একই কারণে মৃত্যু হার কম থাকে। কিন্তু ৫ বৎসর বয়সের পর এই ধারার, বিশেষ করে বিকাশশীল দেশে, বিপরীতমুখী প্রবণতা দেখা যায়। এর কারণ প্রধানত: সামাজিক ও আর্থনীতিক। প্রায় সকল দেশে এবং বিশেষ করে বিকাশশীল দেশে পুরুষ শিশুদের বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এর পেছনে বিবিধ সাংস্কৃতিক কারণও বিদ্যমান। ফলে নারী শিশুরা সহজাত অবহেলার শিকার হয়। এই অবহেলা পারিবারিক পর্যায়ে যত্ন থেকে স্বাস্থ্য-চিকিৎসা, শিক্ষা প্রভৃতির মধ্যে প্রকাশ পেতে থাকে। ফলে, ৫ বৎসর বয়সের পর নারী-শিশুদের মৃত্যু সম্ভাব্যতা পুরুষ-শিশু অপেক্ষা অধিকতর বৃদ্ধি পায়, যা পরিশেষে নারী-শিশুদের উচ্চ মৃত্যুহারের মধ্যে প্রকাশিত হয়। অপরদিকে ১৫-৪৫ বৎসর বয়সে পুরুষ অপেক্ষা নারীদের মধ্যে মৃত্যু হার অধিক পরিলক্ষিত হয়। এই উচ্চ হার বিশেষভাবে বিকাশশীল দেশে দেখা যায়। এর প্রধান কারণ উচ্চ মাতৃ মৃত্যু হার কিন্তু ৪৫ বৎসর বয়সের পর, যখন মহিলাদের সন্তান ধারনের সম্ভাব্যতা কমে যায় বা লোপ পায় তখন তাদের মৃত্যু হার লক্ষ্যণীয়ভাবে কমে যায়। অপরদিকে এই বয়সের পর পুরুষদের মৃত্যু হার বাড়তে থাকে। এর কারণ, সমস্ত কর্মজীবনে পুরুষদের শারীরিক ও মানসিক চাপ বৃদ্ধ বয়সকালে বিভিন্ন রোগাক্রান্ততার মধ্যে প্রকাশ পেতে থাকে এবং তা পরিশেষে তাদের উচ্চ মৃত্যুহারের মধ্যে প্রকাশিত হয়।

বৈবাহিক অবস্থার সাথে মরণশীলতার বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। সাধারণভাবে অবিবাহিতদের তুলনায় বিবাহিতদের মধ্যে মৃত্যু হার কম দেখা যায়। জীবন ধারণে অধিকতর নিয়মানুবর্তিতা, দৈহিক ও মানসিক স্থিতিশীলতা এই ধারার কারণ বলে মনে করা হয়। লক্ষ্যনীয় যে, উন্নত দেশে অবিবাহিতদের মধ্যে আত্মহত্যা প্রবণতা অধিক। গ্রাম ও শহর এলাকার মধ্যে মৃত্যুহারের বিশেষ তারতম্য লক্ষ্যণীয়। উন্নত দেশে সাধারণত: শহরে মৃত্যু হার বেশী হয়ে থাকে। অতি উচ্চ জনসংখ্যা ঘনত্ব, জনাধিক্য, বদ্ধ পরিবেশ ও বিবিধ দূষণ সমস্যা এবং দুর্ঘটনা এর প্রধান কারণ। পশ্চিমা শিল্পোন্নত দেশসমূহ হংকং, সিঙ্গাপুর, যুক্তরাষ্ট্র এবং জাপানের নগরগুলিতে গ্রামাঞ্চলের তুলনায় প্রায় ৫ শতাংশ বেশি মৃত্যু হার পরিলক্ষিত হয়। একই সাথে পেশাও মরনশীলতার তারতম্য ঘটায়। কেননা, পেশার সাথে কর্ম পরিবেশ, আবাসিক অবস্থা, শারীরিক ও মানসিক চাপ প্রভৃতি জড়িত। সাধারণভাবে পেশাদার বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে মৃত্যু হার কম এবং শ্রমজীবী, বিশেষ করে যারা কায়িক শ্রম প্রদান করে থাকে তাদের মধ্যে মৃত্যু হার বেশী হয়ে থাকে। তবে বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে মরণশীলতার পেশাগত পার্থক্য অনেকটা হ্রাস পায়।

সামাগ্রিকভাবে শিক্ষার সাথে মৃত্যু হারের বিপরীতমুখী সম্পর্ক রয়েছে। উচ্চ শিক্ষিতের মধ্যে মৃত্যু হার কম। শিক্ষিতের মধ্যে অধিক সচেতনতাই এর প্রধান কারণ। মরণশীলতার মান একই ধরনের বিপরীতমুখী সম্পর্ক দেখা যায় আয়ের সাথে। নিম্ন আয় সম্পন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে মৃত্যু হার বেশী। আয়

বেশী হলে মৃত্যু হারও কমে যায়। স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণে সক্ষমতা আয় দ্বারা প্রধানত: প্রভাবিত হয় বলে এই ধরণের ধারা লক্ষ্য করা যায়।

পাঠসংক্ষেপ:

মরণশীলতার উপর প্রভাব বিস্তারকারী উপরোক্ত প্রভেদক ছাড়াও ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পর্যায়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, ব্যায়াম, পানাভ্যাস ইত্যাদি মরণশীলতার উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে থাকে - যা একটি জনগোষ্ঠীর বা দেশের মরণশীলতা নির্দিষ্ট পর্যায়ের মধ্যে প্রকাশিত হতে পারে। সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী বিশ্বের বিকাশশীল অঞ্চলে, বিশেষ করে ল্যাটিন আমেরিকা, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এবং দক্ষিণ এশিয়ায় মৃত্যু হার যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে। পশ্চিম এশিয়ার তৈল সম্পদ সমৃদ্ধ দেশসমূহেও মৃত্যু হার সাম্প্রতিককালে যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে। এর কারণ হিসেবে উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা, ঔষধ ও প্রতিষেধক সমূহের ব্যাপক ও দ্রুত প্রসার এবং প্রায় অঞ্চলে আবাসন পরিবেশের উন্নতি উল্লেখযোগ্য। অপরদিকে, আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ফলে দুর্ভিক্ষ ও অনাহার জনিত মৃত্যু-রোধ যেমন সম্ভব হয়েছে তেমনি ম্যালেরিয়া, বসন্ত ও কলেরার মত কতিপয় মহামারী নির্মূলও সম্ভব হয়েছে। অনেক দেশে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন কর্মসূচী এ সমস্তের সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবকারী কারণও বটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ৩.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন:

১. শূন্যস্থান পূরণ করুন:

১.১. সাধারণভাবে ----- বৎসরের কম বয়স্ক শিশু এবং ৬০ বা ৬৫ বৎসরের উপরে বয়স্ক জনগোষ্ঠীর মৃত্যু হার বেশী হয়ে থাকে।

১.২. মরণশীলতা প্রতি ---- জনসংখ্যায় সাধারণত: নির্মিত হয়।

২. সত্য হলে 'স' মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন:

২.১. প্রকৃতপক্ষে, প্রজননশীলতা ও মরণশীলতা সমাজে সংখ্যাগত ভারসাম্য রক্ষা করে।

২.২. ইউরোপের প্রায় সর্বত্র মৃত্যুহারের মাত্রা জন্মহারের উপরে অবস্থান করছে।

২.৩. ৫-২৫ বৎসরের এবং কোন কোন দেশে ৫-২৪ বৎসরের মধ্যে মৃত্যু হার সবচেয়ে বেশী হয়ে থাকে।

২.৪. সামগ্রিকভাবে শিক্ষার সাথে মৃত্যু হারের বিপরীতমুখী সম্পর্ক রয়েছে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১. মরণশীলতা বলতে কি বুঝায়?

২. মরণশীলতার প্রধান কারণ কি?

রচনামূলক প্রশ্ন:

১. মরণশীলতার বিশ্ব বিন্যাস ধারা ব্যাখ্যা কর।

পাঠ-৩.৪ অভিগমন: কারণ

এই পাঠ শেষে আপনি-

- অভিগমনের কারণ; এবং
- অভিগমনের আকর্ষণ-বিকর্ষণ জনিত সম্পর্ক সম্পর্কে ধারনা লাভ করবেন।

প্রযুক্তিগত এবং আর্থনীতিক বিকাশের সাথে সাথে ঐতিহাসিকভাবে মানুষের আবাসস্থল পরিবর্তন করে অন্যত্র গমনও বৃদ্ধি পেয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় যাতায়াত ব্যবস্থা এবং বহুমুখী যানবাহনের প্রভাব বিশেষ গুরুত্ববহ হিসেবে বর্তমানে দেখা দিয়েছে। এই ক্রমবর্ধমান গতায়ত (Mobility) মানুষের মধ্যে অভিগমন করার প্রবণতা বৃদ্ধি করেছে। কিন্তু 'অভিগমন' (Migration) শব্দটির সংজ্ঞার্থ সম্পর্কে মতৈক্য নেই। কেননা মানুষের সব ধরনের গতায়ত বা স্থান পরিবর্তন, যেমন দৈনিক কাজের জন্য কর্মস্থলে গমনাগমন, হাটবাজার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসালয়ে গমন ইত্যাদিকে অভিগমন পর্যায়ভুক্ত করা উচিৎ নয়। কেননা এই সমস্ত কাজ শেষে সকলেই স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করে থাকে।

এ ধরণের স্থানান্তর (Movement) সাময়িক ও স্বল্প দূরত্বে ঘটে থাকে। এতে দীর্ঘমেয়াদী গমনজনিত কোন উদ্দেশ্য থাকে না। তবে অনেক ক্ষেত্রে মানুষ নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে স্বস্থান পরিবর্তন করে বহুদূরে গিয়ে নতুন আবাস স্থাপন করতে পারে। এরূপ স্থায়ী বসবাসের উদ্দেশ্যে দূরান্তে বা অন্য দেশে গমন করাকে অভিগমন (Migration) বলে (অভিগমন = অভিমুখে > গমন = অভিগমন)। লক্ষ্যণীয় অভিগমন প্রক্রিয়ায় দূরত্ব এবং স্থায়ীত্ব বা বসবাস সময় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এই উপাদানের উপর নির্ভর করে অভিগমনের কতিপয় প্রকার ভেদ সম্ভব। যেমন, ঋতুভিত্তিক, অস্থায়ী, পর্যায়ক্রমিক, স্থায়ী, অথবা, বাধ্যকর স্বপ্রনোদিত, পরিকল্পিত, এবং আভ্যন্তরীণ, বহিস্ত:, আন্ত: আঞ্চলিক, আন্তর্জাতিক, মহাদেশীয় ও আন্ত:মহাদেশীয়। তবে এ সমস্ত প্রকারণ দুইটি প্রধান অভিগমনের মধ্যে শ্রেণীভুক্ত করা যায়:

অভিগমনের কারণ : যে কোন অভিগমনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থান নির্বাচনের সাথে জড়িত থাকে। একই সাথে অভিগমনকারীর উৎস থেকে লক্ষ্যস্থল পর্যন্ত একাধিক দূরত্ব ও ব্যয় (সময় ও অর্থ) গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে দেখা দিয়ে থাকে। এই উপাদানের মধ্যে প্রধান কারণ অর্থনৈতিক; তবে রাজনৈতিক, সামাজিক, মানসিক এবং প্রাকৃতিক কারণ অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। অধিক সমৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সাধারণভাবে সকল মানুষেরই কাম্য। একারণে, অর্থনৈতিক উন্নতির বাসনা স্বাভাবিকভাবে অভিগমনের মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে ইউরোপীয়দের আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশে ব্যাপক অভিগমন এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সাম্প্রতিক দশকে বিকাশশীল দেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্র এবং তৈল সমৃদ্ধ পশ্চিমে এশিয়ায় অভিগমন এর প্রমাণ।

ঐতিহাসিকভাবে অতীতে কিছু মানুষের অভিগমনও ঘটেছে। ১৯ শতকের পূর্ব পর্যন্ত আফ্রিকা থেকে দাস ব্যবসার মাধ্যমে বহু নিগ্রোকে বলপূর্বক আমেরিকায় আনা হয়। ১৮৫০-৮৫ সাল পর্যন্ত পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম কানাডায় রেলপথ নির্মাণের জন্য বহু চীনা শ্রমিক এবং এমন কি ভারতীয় শিখ সম্প্রদায়কে আনা হয়। বহু ভারতীয় এই সময় উপনিবিষ্ট কৃষির আওতায় ইক্ষু, কলা, আনারস, কফি, চা ও রাবার চাষের জন্য প্রশন্ত মহাসাগরীয় দ্বীপসমূহ, পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, পূর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ক্যারিবীয় অঞ্চলে আনীত হয়। এমন কি বাংলাদেশে চা চাষের জন্য বৃটিশ আমলে মধ্য ও দক্ষিণ ভারতীয় শ্রমিকদের আনা হয় যারা এখন স্থায়ী অভিগমনকারী জনগোষ্ঠী হিসেবে এদেশে বসবাস করছে।

অর্থনৈতিক কারণ ছাড়াও বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য অতীতকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত মানুষ স্বীয় আবাসস্থল ছেড়ে অন্যত্র অভিগমন করছে।

এর মধ্যে ভূমিকম্প ও অগ্নুৎপাত, বন্যা, দীর্ঘস্থায়ী খরা, নদীভাঙ্গঁন ও মৃত্তিকাক্ষয় এই ধরনের অভিগমনকে প্রভাবিত করেছে। অপরদিকে, মানব সৃষ্ট দুর্যোগ, যেমন, যুদ্ধ ও যুদ্ধাবস্থা, পরিবেশ দূষণ ইত্যাদিও অভিগমনকে উৎসাহিত করেছে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, অভিগমন প্রক্রিয়ায় একদিকে প্রভাবকারী উপাদান হিসেবে লক্ষ্যস্থলে অর্থনৈতিক সম্ভাবনা, সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি আকর্ষণ এবং অপরদিকে উৎসে অভাব-অসুবিধাজনক পরিস্থিতি, অসন্তোষ বা দুর্যোগজনিত অবস্থা নেতিবাচক প্রভাব ফেলে থাকে। এই দুইটি বিপরীতমুখী অবস্থাকে যথাক্রমে আকর্ষণ (Pull) এবং বিকর্ষণ (Push) প্রক্রিয়া হিসেবে আর্থ-সমাজবিদগণ চিহ্নিত করেছেন। এই দুই পর্যায়ের মধ্যবর্তী অবস্থা হিসেবে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা, দূরত্ব ও ব্যয় (সময় ও অর্থ হিসেবে) অন্তবর্তীকালীন উপাদান হিসেবে কাজ করে (চিত্র ৩.৪.১)

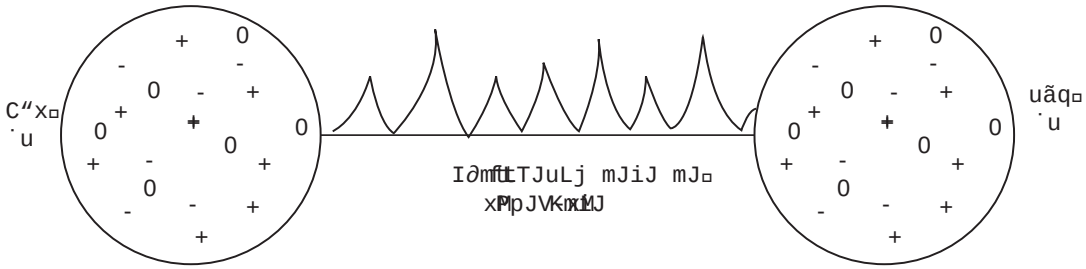

চিত্র- ৩.৪.১: অভিগমনের আকর্ষণ বিকর্ষণ জনিত সম্পর্ক।

অভিগমন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যায় এই আকর্ষণ-বিকর্ষণ জনিত অবস্থা লী (১৯৬৬) ও র‍্যাভেনস্টাইন (১৮৮৫) বিশদ তত্ত্ব প্রদান করেছেন।

এর আওতায়, (ক) আকর্ষণমূলক উপাদানগুলি হলো:

– ভৌগোলিক পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সুবিধাদি;

– আত্মীয়-স্বজন ও গোষ্ঠীয়ভুক্ত জনগনের নৈকট্য লাভ;

– কর্মসংস্থান ও অধিকতর আর্থিক সুবিধাদি;

– পেশাগত বৈশিষ্ট্যের যোগ্য ব্যবহার;

– শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গৃহ-সংস্থান ও সামাজিক নিরাপত্তাগত সুবিধা, জীবনযাত্রা ব্যয়ের নিম্নহার ও পুঁজিগঠনের সুবিধা;

– বিবাহ ও সম্পত্তি প্রাপ্তি সংক্রান্ত ব্যক্তিগত সুবিধা ইত্যাদি।

অপরদিকে, (খ) বিকর্ষণমূলক উপাদানগুলি নিম্নরূপ হতে পারে;

– নেতিবাচক পারিবেশিক চাপ;

– প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রতিক্রিয়া;

– জনাধিক্য এবং এর কারণে পেশাগত ও অর্থনৈতিক চাপ;

– সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক বৈষম্য;

– জাতিগত ও সাম্প্রদায়িক উৎখাত;

– অর্থনৈতিক মন্দা;

– ব্যবসা-বাণিজ্যে ক্রমাগত ক্ষয়ক্ষতি;

– কর্মচ্যুতি ও বেকারত্ব;

– পারিবারিক ও সামাজিক অশান্তি ও ব্যক্তিগত অসুবিধা ইত্যাদি।

অর্থনীতিবিদ এবং সামাজিক জনমিতিবিদদের নিকট গ্রহণযোগ্য হলেও ভূগোলবিদদের নিকট আকর্ষণ-বিকর্ষণ তত্ত্ব পরিপূর্ণভাবে গ্রহণীয় নয়। কেননা, আকর্ষণ-বিকর্ষণ জনিত উপাদানের বাইরেও বহু কারণ আছে যা, অভিগমনকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে থাকে। এই তত্ত্বে এই সমস্ত কারণ গুরুত্ব লাভ করে নাই। বিশেষ করে, বিশ্বের সর্বত্র বিবাহ জনিত কারণে প্রধানত: মহিলাদের স্বামীর সাথে অভিগমন, শিক্ষা লাভের জন্য অভিভাবকের সাথে সন্তানদের স্থানচ্যুতি এবং পুনর্বাসন ইত্যাদি এই আওতায় আনা হয় নাই। এ কারণে, ভূগোলবিদগণ বোগ (১৯৭০) প্রণীত অভিগমনের কারণসমূহ অধিকতর গ্রহণযোগ্য মনে করেন। এই গ্রহণযোগ্যতার অপর কারণ হলো, কারণগুলি আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উভয় অভিগমন প্রক্রিয়ার জন্য যেমন প্রযোজ্য তেমনি আকর্ষণ-বিকর্ষণ জনিত উপাদানগুলিকেও যথাযথ বিবেচনা করে ।

বোগ (ক) ২৫ টি ব্যক্তিগত পর্যায়ে অভিগমন-উদ্রেককারী পরিস্থিতি (খ) ১৫টি লক্ষ্যস্থল নির্বাচনের উপাদান, এবং (গ) ১০টি আর্থ-সামাজিক অবস্থা যা অভিগমণকে ইতিবাচক ও নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে বলে চিহ্নিত করেছেন। সংক্ষেপে এগুলি হলো :

অভিগমন উদ্রেককারী পরিস্থিতি:

শিক্ষাজীবনের সমাপ্তি; বিবাহ; বিবাহহীনতা; চাকুরীর সুযোগ; চাকুরী গ্রহণ; ভ্রাম্যমান কর্ম; বিশেষায়িত দক্ষতা; চাকুরী ক্ষেত্রে বদলী; ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বিক্রয়;ব্যবসায় ক্ষতি; চাকুরী থেকে প্রত্যাহার; নিম্ন বেতন; অবসর গ্রহণ; আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যু; সামরিক বাহিনীতে চাকুরী; স্বাস্থ্যগত পরিচর্যা; কারা ভোগ; রাজনৈতিক; জাতিগত অথবা ধর্মীয় উৎপীড়ন; প্রাকৃতিক দুর্যোগ; বহিরাগতদের অনুপ্রেবেশ বা অভিযাত্রা; উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পদ প্রাপ্তি; নির্দিষ্ট সমাজে খাপ না খাওয়া; পরিভ্রমণতা; সামাজিকভাবে অবাঞ্ছিত হওয়া বাধ্যকর স্থানান্তর।

লক্ষ্যস্থল নির্বাচনের উপাদান:

অভিগমনে ব্যয়; আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবের উপস্থিতি; তাদের সাথে অবস্থানের সম্ভাবনা; চাকুরীর সুযোগ; স্থান বিশেষের ভৌত আকর্ষণ; প্রাকৃতিক পরিবেশ; বিভিন্ন সেবা-সুবিধাদি; জনসংখ্যার কাঠামো; বিশেষায়িত চাকুরীর সুবিধা; লক্ষ্যস্থল সম্পর্কে পূর্ব অভিজ্ঞতা; বিশেষ সহায়তা গ্রহণের সুবিধা; ভাতা প্রাপ্তি; তথ্য প্রাপ্তির সুবিধা; লক্ষ্যস্থলের খ্যাতি; বিকল্প লক্ষ্যস্থলের অভাব।

আর্থ-সামাজিক অবস্থা:

বিশেষ মাত্রায় পুঁজি বিনিয়োগ; ব্যাপক ব্যবসায়িক মন্দা বা উত্থান-পতন; প্রযুক্তিগত পরিবর্তন; অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার পরিবর্তন; সামাজিক নিরাপত্তার সুবিধা; অভিগমন সম্পর্কীয় প্রচার ও অভিগমন সংক্রান্ত বিধিমালা; জীবন যাত্রা মানের অবস্থা ও মাত্রা; সর্বশ্রেণীর সংখ্যালঘুদের প্রতি সহনশীলতা, অভিগমন নীতি।

বোগের দৃষ্টিভঙ্গিতে অভিগমন ব্যাখ্যায় আরও কিছু পরিস্থিতি বিবেচনায় আনা প্রয়োজন। এগুলি হলো: উৎস ও লক্ষ্যস্থলে জনসংখ্যা চাপ ও বৃদ্ধিধারা, ভূমির প্রাপ্যতা, যাতায়াত সুবিধাদি। এর সাথে ভূগোলবিদগণ জলবায়ু, উদ্ভিদ ইত্যাদি পরিবেশগত অবস্থাও বিবেচনাধীন রাখেন।

অভিগমন প্রক্রিয়ায় একটি দেশে আয়তনও গুরুত্ববহ। বৃহৎ দেশসমূহ আভ্যন্তরীণ অভিগমন উৎসাহিত করে থাকে (যেমন, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা)। ক্ষুদ্র দেশসমূহের জন্য আন্তর্জাতিক অভিগমন ছাড়া কোন বিকল্প নেই। এর সাথে প্রাকৃতিক বাধাবিপত্তি, অভিগমন পথ ও অঞ্চল অভিগমন প্রবাহকে প্রভাবিত করে থাকে। এ সমস্ত বিষয়াদি একজন অভিগমনকারীর লক্ষ্যস্থল নির্ধারণের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হয়ে থাকে।

পাঠসংক্ষেপ:

ব্যক্তি বিশেষ বা জনগোষ্ঠীদের স্থায়ী বা দীর্ঘ স্থায়ী আবাসস্থল হতে অন্যত্র স্থান পরিবর্তনকে বলে অভিগমন। এ ধরণের স্থানান্তর (Movement) সাময়িক ও স্বল্প দূরত্বে ঘটে থাকে। এতে দীর্ঘমেয়াদী গমনজনিত কোন উদ্দেশ্য থাকে না। এই উপাদানের উপর নির্ভর করে অভিগমনের কতিপয় প্রকার ভেদ সম্ভব। যেমন, ঋতুভিত্তিক, অস্থায়ী, পর্যায়ক্রমিক, স্থায়ী, অথবা বাধ্যকর স্বপ্রণোদিত, পরিকল্পিত, এবং আভ্যন্তরীণ, বহিস্ত:, আন্ত: আঞ্চলিক, আন্তর্জাতিক, মহাদেশীয় ও আন্ত:মহাদেশীয়। তবে এ সমস্ত প্রকারণ দুইটি প্রধান অভিগমনের মধ্যে শ্রেণীভুক্ত করা যায়: (ক) আভ্যন্তরীণ, এবং (খ) আন্তর্জাতিক।

যে কোন অভিগমনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থান নির্বাচনের সাথে জড়িত থাকে। একই সাথে অভিগমনকারীর উৎস থেকে লক্ষ্যস্থল পর্যন্ত একাধিক দূরত্ব ও ব্যয় (সময় ও অর্থ) গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে দেখা দিয়ে থাকে। এই উপাদানের মধ্যে প্রধান কারণ অর্থনৈতিক; তবে রাজনৈতিক, সামাজিক, মানসিক এবং প্রাকৃতিক কারণ অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। অভিগমন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যায় এই আকর্ষণ-বিকর্ষণ জনিত অবস্থা লী (১৯৬৬) ও র‍্যাভেনস্টাইন (১৮৮৫) বিশদ তত্ত্ব প্রদান করেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ৩.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. শূন্যস্থান পূরণ করুনঃ

১.১. ------- প্রক্রিয়ায় যাতায়াত ব্যবস্থা এবং বহুমুখী যানবাহনের প্রভাব বিশেষ গুরুত্ববহ হিসেবে বর্তমানে দেখা দিয়েছে।

১.২. ------- বসবাসের উদ্দেশ্যে দূরান্তে বা অন্য দেশে গমন করাকে অভিগমন বলে।

১.৩. যে কোন অভিগমনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ------- নির্বাচনের সাথে জড়িত থাকে।

১.৪. অর্থনীতিবিদ এবং ------- জনমিতিবিদদের নিকট গ্রহণযোগ্য হলেও ভূগোলবিদদের নিকট আকর্ষণ-বিকর্ষণ তত্ত্ব পরিপূর্ণভাবে গ্রহণীয় নয়।

১.৫. বৃহৎ দেশসমূহ ------- অভিগমন উৎসাহিত করে থাকে।

১.৬. ক্ষুদ্র দেশসমূহের জন্য ------- অভিগমন ছাড়া কোন বিকল্প নেই।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১. অভিগমন কাকে বলে?

২. অভিগমনের কারণসমূহ কি কি?

৩. অভিগমন প্রক্রিয়ায় ব্যাখ্যায় বর্ণিত পাঁচটি আকর্ষণীয় উপাদান লিখুন।

৪. অভিগমন প্রক্রিয়ায় ব্যাখ্যায় বর্ণিত পাঁচটি বিকর্ষণমূলক উপাদান লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. অভিগমনের সংজ্ঞা দাও। অভিগমন, গতয়াত এবং স্থানান্তরের মধ্যে পার্থক্যকরণ করুন। আর্থ নীতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে অভিগমন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ-৩.৫ অভিগমনঃ শ্রেণীবিভাগ

গমণ গমণ

এই পাঠ শেষে আপনি-

- অভিগমনের শ্রেণীবিভাগ;
- আন্তর্জাতিক অভিগমন;
- আভ্যন্তরীণ অভিগমন; এবং
- ঋতুভিত্তিক অভিগমন সম্পর্কে ধারনা লাভ করবেন।

অনেক ক্ষেত্রে মানুষ নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে স্বস্থান পরিবর্তন করে বহুদূরে গিয়ে নতুন আবাস স্থাপন করতে পারে। এরূপ স্থায়ী বসবাসের উদ্দেশ্যে দূরান্তে বা অন্য দেশে গমন করাকে অভিগমন (Migration) বলে (অভিগমন = অভিমুখে > গমন = অভিগমন)। লক্ষ্যণীয় অভিগমন প্রক্রিয়ায় দূরত্ব এবং স্থায়ীত্ব বা বসবাস সময় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এই উপাদানের উপর নির্ভর করে অভিগমনের কতিপয় প্রকার ভেদ সম্ভব। যেমন, ঋতুভিত্তিক, অস্থায়ী, পর্যায়ক্রমিক, স্থায়ী, অথবা, বাধ্যকর স্বপ্রণোদিত, পরিকল্পিত, এবং আভ্যন্তরীণ, বহিস্ত:, আন্ত: আঞ্চলিক, আন্তর্জাতিক, মহাদেশীয় ও আন্ত:মহাদেশীয়। তবে এ সমস্ত প্রকারণ দুইটি প্রধান অভিগমনের মধ্যে শ্রেণীভুক্ত করা যায়:

(ক) আভ্যন্তরীণ, এবং (খ) আন্তর্জাতিক।

এই শ্রেণীকরণ অভিগমনের সংজ্ঞাগত ও তত্ত্বীয় দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং ভৌগলিক পেক্ষাপটে দেশীয় ও বহির্দেশীয় রাষ্ট্রীয় সীমানার সাথে সম্পর্কযুক্ত। এই প্রক্রিয়ায় দুইটি পর্যায় জড়িত : বহির্গমন (Emigration) এবং আগমন (Immigration), অর্থাৎ যথাক্রমে বসবাসের উদ্দেশ্যে একটি দেশ থেকে প্রস্থান এবং অন্যদেশ থেকে একটি দেশে আগমন বুঝিয়ে থাকে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, একটি জনগোষ্ঠীর বা দেশের সকলেই অভিগমন করে না। অভিগমনকারীগণ কতিপয় বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হয়ে থাকে। এই বৈশিষ্ট্যের কারণে অভিগমনধারার মধ্যে বিভিন্নতা দেখা যায়। অভিগমনকারীগণ বিশেষভাবে বয়-নির্দিষ্ট হয়ে থাকে-অর্থাৎ নির্দিষ্ট বয়সসীমার মধ্যে, বিশেষ করে যুবা বয়সে (১৫-৩০) জনগণ অভিগমন করে থাকে। এই বয়সকালে জনগণ উদ্যোমী, কষ্টসহিষ্ণু, পেশাগত কারণে অনুসন্ধানপ্রবণ এবং বিভিন্ন পরিবেশে নিজেকে খাপ খাওয়াতে বেশী সক্ষম হয়। এই বৈশিষ্ট্যের সাথে শিক্ষাগত অবস্থান একটি বিশেষ ইতিবাচক অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ এই বয়সকালে শিক্ষিত যুবকগণ পেশাগতস্থানে বা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে (যেমন উচ্চ শিক্ষা, ভাল অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা ইত্যাদি) অধিকতর অভিগমনপ্রবণ হয়ে থাকে। উভয় ক্ষেত্রে মহিলাদের চাইতে পুরুষগণ বেশি মাত্রায় অভিগমনপ্রবণ হয়ে থাকে। এই প্রবণতা বিশেষভাবে বিকাশশীল দেশসমূহে পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে আবার অবিবাহিতগণের মধ্যে অভিগমন হার অধিক দেখা যায়। এক্ষেত্রেও অবিবাহিত পুরুষগণ মহিলাদের চাইতে অধিকহারে অভিগমন করে থাকে। কিন্তু যুবা বয়:শ্রেণীতে মহিলাগণ বৈবাহিক কারণে স্বামীর সাথে অধিক মাত্রায় অভিগমন করে থাকে। বিষয়টি উন্নত ও বিকাশশীল উভয় অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য। কিছু কিছু পেশাগত শ্রেণীর মধ্যে অভিগমনপ্রবণতা অধিক লক্ষ্য করা যায়। দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকদের তুলনায় পেশাজীবীগণ অধিকহারে অভিগমনপ্রবণ। বেকারগণও অধিকমাত্রায় অভিগমন করে থাকে।

আভ্যন্তরীণ অভিগমন

আভ্যন্তরীণ অভিগমনের মধ্যে ঋতু ভিত্তিক অভিগমন, সাময়িক অভিগমন, গ্রাম-নগর ও নগর-গ্রাম অভিগমন এবং আন্ত:আঞ্চলিক অভিগমন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আভ্যন্তরীণ অভিগমন প্রক্রিয়াগতভাবে অবশ্যই একটি দেশের রাজনৈতিক সীমানার ভিতরে ঘটে থাকে।

ঋতু ভিত্তিক অভিগমন: অনেকদেশে স্থায়ী বসতসম্পন্ন জনগোষ্ঠী এবং ভ্রাম্যমান বা যাযাবর বৃত্তিক জনগোষ্ঠীর অভিগমন প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্যকরণ করা হয়ে থাকে। এসব ক্ষেত্রে আদিম উপজাতীয় জনগোষ্ঠী প্রাথমিক পর্যায়ের আর্থনীতিক কর্মকান্ডের আওতায় ঋতু ভিত্তিক পরিব্রাজনশীল জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে থাকে। এরা প্রধানত: খাদ্য অনুসন্ধান বা উৎপাদন, কৃষি নির্ভর অথবা অর্থনীতিক উপার্জনশীল অবলম্বন হিসেবে চারণ বৃত্তিক পেশা নির্ভর হয়ে থাকে। আফ্রিকা, দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহে প্রাথমোক্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঋতু ভিত্তিক স্থান পরিবর্তনকারী জনগোষ্ঠী দেখা যায়। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্রগ্রামের জেলাসমূহে ঝুম চাষে অভ্যস্ত আদি জনগোষ্ঠী এই শ্রেণীর। অপরদিকে, পশ্চিম এশিয়া ও মধ্য এশিয়ার দেশসমূহে সাইবেরিয়া, মঙ্গোলিয়া এবং আলাস্কার ইনুইটস্দের মধ্যে পশু চারণ বৃত্তিসম্পন্ন ঋতু ভিত্তিক স্থান পবির্তনশীল জনগোষ্ঠী দেখা যায়। তবে উভয় শ্রেণীই কোন অঞ্চলের নির্দিষ্ট পরিসীমার মধ্যে তাদের গতায়ত সীমাবদ্ধ রাখে এবং একটি পর্যায়ে উৎস স্থলে ফিরে আসে। নির্দিষ্ট বৎসরে এই গতিশীলতার আবর্তণ লক্ষ্য করা যায়। লক্ষ্যণীয় যে, প্রকৃত অর্থে এই ধরনের স্থানান্তরকে অভিগমনের পর্যায়ে ফেলা যায় না। অপরদিকে, বিভিন্ন দেশে আধুনিকায়ন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের ফলে এই সমস্ত জনগোষ্ঠীর জীবন ধারা ও পরিব্রাজনশীলতার পরিবর্তন যথেষ্ট মাত্রায় ঘটেছে।

সাময়িক অভিগমন

অনেক অভিগমনকারী নিজ স্থায়ী আবাস থেকে নির্দিষ্ট কয়েক বৎসর অন্যত্র অবস্থান করে থাকে। এরা প্রধানত: অস্থায়ী অভিগমনকারী এবং অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্য এ ধরনের অভিগমন করে থাকে। অর্থ উপার্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সময়কালটিতে এরা মূল আবাসস্থলে নিয়মিত অর্থ প্রেরণ করে স্বদেশে নিজেকে এবং নিজ পরিবারকে বিত্তশালী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে থাকে। ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ও বেশ কিছু উত্তর আফ্রিকার দেশ থেকে পশ্চিম এশিয়ার পেট্রোলিয়াম তেল সমৃদ্ধ দেশসমূহে এরূপ অভিগমন সাম্প্রতিক দশকে এশীয় অঞ্চলটির মোট জনসংখ্যার ৫০ শতাংশের অধিক ছিল। বর্তমানে এই হারের নিম্নগতি লক্ষ্য করা যায়। অতীতে এ ধরনের অভিগমন পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার খনিজ সমৃদ্ধ এলাকায় ঘটেছিল। এ ছাড়া বেশ কিছু বাণিজ্যিক কৃষি এবং উপনিবিষ্ট কৃষি অঞ্চলে, যেমন, যুক্তরাষ্ট্রের তুলা ও খাদ্যশষ্য এলাকা, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় বেশ কিছু দ্বীপ এলাকায় কলা, ইক্ষু, আনারস খামারে এবং পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, ভারত, মধ্য-পূর্ব আফ্রিকার চা ও কফি খামারে এরূপ অভিগমন ঘটেছে। বর্তমানে এই ধারা পরিবর্তিত হয়ে প্রযুক্তি নির্ভর উৎপাদনের সাথে এই ধরনের অভিগমন সম্পৃক্ত হয়েছে। বর্তমানে অর্থ উপার্জনের লক্ষ্যে বিকাশশীল দেশসমূহ থেকে পশ্চিম এশীয় দেশসমূহসহ কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান এবং অস্ট্রেলিয়ায় এরূপ অভিযান ঘটেছে। লক্ষ্যণীয়, এ ধরনের অভিগমনকারীদের মধ্যে অনেকসময় লক্ষ্যস্থল দেশে স্থায়ীভাবে বসবাসের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এরূপ ক্ষেত্রে এরা স্থায়ী অভিগমনকারী হিসেবে গণ্য হয়।

গ্রাম-শহর এবং শহর-নগর অভিগমন: গ্রাম এলাকা থেকে শহরাঞ্চলে অভিগমন সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ এবং জনগোষ্ঠীর সর্বত্র প্রচলিত একটি ধারা। বিশেষ করে শিল্প উন্নয়নমূখী দেশসমূহে এই ধারা

বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। অর্থাৎ এই অভিগমন প্রক্রিয়া অর্থনৈতিক বিকাশ, মাথা পিছু আয় বৃদ্ধি এবং শিল্প ভিত্তিক নগর ও সার্বিক নগরায়নের সাথে সম্পর্কীয়। পাশ্চাত্য দেশসমূহের অধিকাংশ আভ্যন্তরীণ অভিগমন এ সমস্ত কারণে ঘটেছে। তবে অতিরিক্ত নগরায়ন-প্রবণ দেশসমূহে, যেমন, বৃটেন এবং জাপানে, আন্ত:নগর অভিগমনও লক্ষ্য করা যায়।

গ্রাম-শহর অভিগমনের ক্ষেত্রে উৎসস্থলে জনাধিক্য, কৃষিতে আধুনিকায়ন কিন্তু সনাতন ভূমি স্বত্বের অপরিবর্তন ধারা এরূপ অভিগমনে উদ্রেককারী পরিস্থিতি সৃষ্টি করে থাকে। অপরদিকে, নগরাঞ্চলে কাজকর্ম বা চাকুরীর সুযোগ, জীবন-যাত্রা মান উন্নয়নের সম্ভাবনা এবং নগরীর সুবিধাদি (যেমন, শিক্ষা, বিনোদন, চিকিৎসা সেবা ইত্যাদি) লক্ষ্যস্থল নির্ধারক উপাদান হিসেবে কাজ করে। এর সাথে পরিবহন ব্যবস্থার বিকাশ এবং কৃষি অর্থনীতির স্থবিরতা অনেক বিকাশশীল দেশে (যেমন, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশসমূহে) গ্রাম-নগর অভিগমনকে উৎসাহিত করেছে। এর ফলে গ্রামীণ ও শহুরে সাংস্কৃতির সংযোগ বৃদ্ধি পেলেও কিছু কিছু দেশে, যেমন, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল ও বাংলাদেশ সামগ্রিক নগরায়নের উপর এ ধরনের অভিগমনের তেমন প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না। বরং এ সমস্ত দেশের নগরে অপ্রাতিষ্ঠানিক ও অপরিকল্পিত কর্মকান্ডের বিকাশ নগরায়ন ধারার উপর নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করেছে। বিশেষ করে বিকাশশীল দেশের নগরাঞ্চলে এই ধরনের অভিগমন এক ধরনের পেশাগত মিশ্রণ সৃষ্টি করেছে।

তবে প্রায় সকলদেশে গ্রাম-নগর অভিগমন সব সময়ে সরাসরি ঘটে না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অভিগমনকারীগণ নিকটবর্তী শহরে প্রথমে গমন করে এবং পর্যাযক্রমে বড় শহরে গমন করে। একে পর্যায় ক্রমিক অভিগমন (Step Migration) বলে। অভিগমনের একটি শুভদিক হলো নগর থেকে গ্রামে সম্পদের প্রসার কেননা নগরে উপার্জিত অর্থের একাংশ অভিগমনকারীরা গ্রামে বসবাসরত পরিবারের নিকট নিয়মিত প্রেরণ করে থাকে।

এই অর্থ-সম্পদ বৃদ্ধিতে, বিশেষ করে ভূমি ক্রয়ে বিনিয়োগ হয়। সাম্প্রতিক দশকে বিকাশশীল দেশ থেকে উন্নত দেশে বা পশ্চিম এশীয় তৈল সমৃদ্ধ দেশে অভিগমনকারীদের প্রেরিত অর্থ প্রধানত: ভূমি ক্রয়ে বিনিয়োগ হয়েছে।

নগর থেকে গ্রামে অভিগমন উন্নতদেশে অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক ধারা বলা যেতে পারে। নগরে অতি জনাধিক্য বিবিধ ধরনের দূষণ ও স্বাস্থ্যগত সমস্যা, আবাসন সমস্যা পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি ও ব্যাপ্তী এই ধরনের অভিগমনকে উৎসাহিত করেছে। বিশেষ করে শিল্পোন্নত দেশসমূহের অধিবাসীদের শহর থেকে শহরের বাইরে ভাল পরিবহণ ব্যবস্থাযুক্ত শহরতলী বা শহর উপকণ্ঠ এলাকায় বসবাসের প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অনেকে নগরাঞ্চলে কর্মজীবন শেষে গ্রামে প্রত্যাবর্তন করছে নগরীয় জটিল ও.ায়ুবিক চাপযুক্ত পরিবেশ থেকে মুক্তি পাবার উদ্দেশ্য। যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও বৃটেনের বৃহৎ নগর থেকে শহরতলী ও গ্রামে এ ধরনের অভিগমন বৃদ্ধি পাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, লন্ডন শহরের জনসংখ্যা বর্তমানে নিম্নমুখী। এরূপ ক্ষেত্রে শিল্প ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান, প্রতিযোগিতা, অর্থনৈতিক মন্দা ইত্যাদি এই ধরনের অভিগমনের পেছনে ক্রিয়াশীল বলে মনে করা হয়।

আন্ত: আঞ্চলিক অভিগমন : একটি দেশের বা অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে এই ধরনের অভিগমন ঘটে। অনেক দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের সাথে আন্ত: আঞ্চলিক অভিগমণ সম্পর্কযুক্ত। এ প্রসঙ্গে দুইটি অভিগমনধারা বিশেষ উল্লেখ্য: ঔপনিবেশিক অভিগমন এবং জনগোষ্ঠীর সাধারণ ভ্রাম্যমানতা। প্রথমটি, স্বত:স্ফূর্ত ও পরিকল্পিত এবং ঔপনিবেশিককালে উপনিবিষ্ট কৃষি, নতুন ভূমি ও জনপদ পত্তন এবং অর্থনৈতিক উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে জড়িত ছিল। ১৮ ও ১৯ শতকে দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, প্রশান্ত মহাসগরীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে অভিগমন শ্রেণীগুলি আন্ত:আঞ্চলিক

ধরনের। এই অভিগমন নির্দিষ্ট ঔপনিবেশিক এলাকায় ঘটেছে। যদিও দূরত্বের মাত্রা অধিক ছিল। অপরদিকে, ভ্রাম্যমানতা কেন্দ্রিক অভিগমন প্রধানত: পাশ্চাত্যদেশসমূহে বিভিন্ন প্রবৃদ্ধি কেন্দ্র বিকাশের সাথে শ্রমিক অভিগমনে যুক্ত ছিল। কোন কোন দেশে যেমন, ভূতপূর্ব সোভিয়েত রাশিয়ার এবং অতীতে যুক্তরাষ্ট্রে কৃষি শ্রমিকদের আন্ত:আঞ্চলিক ভ্রাম্যমানতার সাথে আন্ত:আঞ্চলিক অভিযান সম্পর্কীয় ছিল।

বর্তমানে, বহুদেশে কৃষি ও শিল্প-ভিত্তিক শ্রমিকদের আন্ত:আঞ্চলিক অভিগমনের ধারা লক্ষণীয়। চীন এবং দক্ষিণ এশিয়ায় কৃষি শ্রমিকদের নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ফসল বপন বা কর্তনের জন্য অভিগমন, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং মধ্য আমেরিকার দেশসমূহে তৈরী পোশাক শিল্পকেন্দ্র, ইলেকট্রনিকস্ শিল্প এবং বিশেষায়িত শিল্প অঞ্চলে শ্রমিক অভিগমনসমূহ আন্ত:আঞ্চলিক পর্যায়ে ফেলা যায়।

আন্তর্জাতিক অভিগমন

বোগ-এর দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী অভিগমনের মূল কারণের প্রায় সবই আন্তর্জাতিক অভিগমনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এদিক থেকে আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক অভিগমনের কারণের মধ্যে তেমন কোন তারতম্য নেই। কিন্তু এদের মধ্যে প্রধান প্রক্রিয়াগত পার্থক্য এই যে, আন্তর্জাতিক অভিগমন দুই বা ততোধিক দেশের রাজনৈতিক সীমানার বাইরে ঘটে থাকে- অর্থাৎ অভিগমনকারীকে নিজ দেশ ত্যাগ করে লক্ষ্যস্থল হিসেবে অপর একটি দেশে অন্তত: নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গমন করতে হবে। আন্তর্জাতিক অভিগমনের মুখ্য কারণ প্রধানত: অর্থনৈতিক। তবে সাম্প্রতিককালে রাজনৈতিক, ভূ-রাজনৈতিক, সাম্প্রদায়িক, এমন কি আদর্শিক কারণও আন্তর্জাতিক অভিগমনের ক্ষেত্রে গুরুত্বলাভ করছে।

১৯ শতকের ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার আন্তর্জাতিক অভিগমন প্রধানত: অর্থনৈতিক কারণে, বিশেষ করে, কৃষি দ্রব্য উৎপাদনের সাথে জড়িত ছিল। এর পর পরই বিভিন্ন খনিজ পদার্থ (বিশেষ করে, কয়লা লৌহ ও স্বর্ণ) আহরণের জন্য বহু ইউরোপীয় অধিবাসী আমেরিকায় অভিগমন করে। এমন কি এই সময় বিশেষ করে পশ্চিম আফ্রিকা থেকে শ্রমিক হিসেবে নিগ্রো জনগোষ্ঠীকে বলপূর্বক যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে যাওয়া হয়। এই প্রক্রিয়াকে 'বাধ্যকর অভিগমন' বলা হয়। অপরদিকে, বৃটেন থেকে সাধারণ অভিগমনকারীদের সাথে সাথে অপরাধীদের ব্যাপকহারে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ থেকে আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়ায় ব্যাপকহারে আন্তর্জাতিক অভিগমন ঘটতে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলে ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে ইউরোপীয়দের সীমিত অভিগমন ঘটে। বর্তমানে এই প্রক্রিয়ার অবসান ঘটেছে কিন্তু এর জনমিতিক প্রতিক্রিয়া এই সমস্ত মহাদেশের দেশসমূহের এখন যথেষ্ট প্রকাশমান।

বর্তমান শতকে আন্তর্জাতিক অভিগমন প্রধানত: জনমিতিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তিক। মহাদেশীয় পর্যায়ে আঞ্চলিক জনসংখ্যার চাপ, অর্থনৈতিক মন্দা এবং অঞ্চল বিশেষে বিভিন্ন দেশে শিল্পের বিকাশ বিশেষ করে বিকাশশীল দেশসমূহের জনগোষ্ঠীকে আন্তর্জাতিক অভিগমনে উৎসাহিত করেছে। এই ধারা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আরও সক্রিয় হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, মাত্র ৪১০৫ বর্গ মাইল আয়তন সম্পন্ন লেবাননের প্রায় ২০০০,০০০ জনসংখ্যার ১,৫০০,০০০ জন দেশের বাইরে অভিগমন করেছে। এরা প্রধানত: ব্যবসায়ী এবং ব্যাংকার হিসেবে যথেষ্ট বৈদেশিক মুদ্রা লেবাননে প্রেরণ করে দেশটিকে সমৃদ্ধিশালী করেছে। পরবর্তীতে একই ধরনের অভিগমন, কিন্তু সীমিত পর্যায়ে, দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়া, পূর্ব এশিয়া, এবং মধ্য আমেরিকার দেশসমূহ থেকে পশ্চিম এশিয়ার তৈল সমৃদ্ধ দেশসমূহে ঘটেছে।

সাম্প্রতিককালে প্রায়শ: বিভিন্ন দেশের অভিগমন সম্পর্কীয় নীতি প্রধানত: আন্তর্জাতিক অভিগমনকে প্রভাবিত করেছে। এ ধরনের নীতি একটি দেশের সামগ্রিক জনমিতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে গৃহীত হয়েছে। প্রায় সকল পশ্চিম ইউরোপীয় দেশ এবং জাপান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বহির্গমনকে উৎসাহিত করেছে। অপরদিকে ভূতপূর্ব কম্যুনিষ্ট দেশেসমূহ বহির্গমনকে নিরুৎসাহিত করলেও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার পর এই সমস্ত দেশ বিশেষ করে রাশিয়া এবং পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহ বহির্গমনকে এখন উৎসাহিত করেছে। গত এক শতাব্দীর বেশী সময় থেকে কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র এবং অস্ট্রেলিয়ায় বসবাস করার জন্য আন্তর্জাতিক অভিগমনকে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু গত কয়েক দশক থেকে এই ধারার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে একটি দেশে বহিরাগতদের আগমন নীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই নীতি আবার কোন কোন ক্ষেত্রে অঞ্চল বা বর্ণ কেন্দ্রীক হয়ে থাকে। যেমন, অস্ট্রেলিয়া বা ক্যানাডা যেমন ইউরোপীয় বংশদ্ভুত অধিবাসীদের গ্রহণ করে থাকে সে হারে এশীয়দের গ্রহণ করে না। একইভাবে, ভূতপূর্ব সমাজতান্ত্রিক দেশ থেকে অভিগমনকারীদের যুক্তরাষ্ট্র যে হারে গ্রহণ করে থাকে সে হারে এশীয়, চীন বা আফ্রিকা বংশদ্ভূত জনগোষ্ঠীকে গ্রহণ করে না। এতদসত্ত্বেও বতর্মানে যুক্তরাষ্ট্র সীমিত সংখ্যায় কোটা ও লটারী প্রথায় পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বহিরাগতদের গ্রহণ করেছে। আন্তর্জাতিক অভিগমন ধারায় এ ধরনের বৈশিষ্ট্য অনেক সময়, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক নীতি বা দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে। তবে প্রায় দেশের ক্ষেত্রে আর্ন্তজাতিক অভিগমনের সুযোগ ও সম্ভাবনা সীমিত হয়ে পড়েছে।

এতদ্সত্বেও, বেশ কিছু উন্নত দেশ (যেমন কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল, যুক্তরাজ্য এবং অস্ট্রেলিয়া) যুদ্ধ-বিগ্রহ, বর্ণগত সংঘাত এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে স্থানচ্যুত জনগোষ্ঠীকে সীমিত হারে স্থায়ীভাবে আশ্রয় প্রদান করেছে। সাম্প্রতিককালে বিশেষ করে যুদ্ধের কারণে বহু উদ্ধাস্তু জনগোষ্ঠী নিকটতম প্রতিবেশী দেশে স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে অভিগমন করেছে। এর মধ্যে ইউরোপের বসনিয়া-হার্জেগোভিনা, কসোভো, রুয়ান্ডা-বুরুন্ডি, প্যালেস্টাইন এবং আফগান উদ্ধাস্তুদের উদাহরণ উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইউরোপ থেকে ১৯৪০-৫০ সালের মধ্যে এ ধরনের বেশ কিছু উদ্ধাস্তু জনগোষ্ঠী আন্তর্জাতিক অভিগমন পর্যায়ে গণ্য হয়ে বিভিন্ন দেশে আশ্রয় লাভ করেছে।

সারণী ৩.৫.১: প্রধান আন্তর্জাতিক অভিগমন ধারা:

১৮২৫-১৯২০:			
যুক্তরাজ্য থেকে যুক্তরাষ্ট্র	১১ মিলিয়ন	ভারত থেকে পাকিস্তান	৬ মিলিয়ন
যুক্তরাজ্য থেকে কানাডা	৩ মিলিয়ন	পাকিস্তান থেকে ভারত	৫ মিলিয়ন

যুক্তরাজ্য থেকে অস্ট্রেলিয়া	২ মিলিয়ন	ইসরায়েল থেকে জর্ডান	
যুক্তরাজ্য থেকে দ:আফ্রিকা	১ মিলিয়ন	অন্যান্য আরব রাষ্ট্র	৭ মিলিয়ন
১৯১০-১৯২০:			
ইটালী থেকে যুক্তরাষ্ট্র	৬ মিলিয়ন	আফগানিস্তান থেকে পাকিস্তান	৩ মিলিয়ন
অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয়া থেকে যুক্তরাষ্ট্র	৩ মিলিয়ন	রাশিয়া থেকে যুক্তরাষ্ট্র	১ মিলিয়ন
যুক্তরাজ্য থেকে যুক্তরাষ্ট্র	৩ মিলিয়ন	ভিয়েতনাম থেকে যুক্তরাষ্ট্র	১ মিলিয়ন
ফ্রান্স থেকে যুক্তরাষ্ট্র	২ মিলিয়ন	ভিয়েতনাম থেকে দ:পূ: এশিয়া	০.৫ মিলিয়ন
১৯৪৩ -১৯৮০:			
জার্মানী ও পোল্যান্ড থেকে ইসরায়েল	১০ মিলিয়ন	কম্বোডিয়া থেকে দ:পূ: এশিয়া	০.৫ মিলিয়ন
		১৯৮০-৯৯:	
		আফগানিস্তান থেকে পাকিস্তান,	
		উজবেকিস্তান, আজারবাইজান ও ইরান	১ মিলিয়ন
		বসনিয়া- হার্জেগভিনা থেকে ইউরোপের অন্যান্য দেশে	০.৩ মিলিয়ন
		কসভো থেকে আলবেনিয়া ও অন্যত্র	০২ মিলিয়ন

ছকে বর্নিত প্রায় সমস্ত জনসংখ্যাকে উদ্বাস্তু শ্রেণীভুক্ত হলেও পরিশেষে এরা সকলেই সংশ্লিষ্ট দেশসমূহে স্থায়ী বসবাসের অধিকার লাভ করাতে আন্তর্জাতিক অভিগমন পর্যায়ভুক্ত হয়েছে।

পাঠসংক্ষেপ:

অনেক ক্ষেত্রে মানুষ নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে স্বস্থান পরিবর্তন করে বহুদূরে গিয়ে নতুন আবাস স্থাপন করতে পারে। এরূপ স্থায়ী বসবাসের উদ্দেশ্যে দূরান্তে বা অন্য দেশে গমন করাকে অভিগমন (Migration) বলে।

আভ্যন্তরীণ অভিগমনের মধ্যে ঋতু ভিত্তিক অভিগমন, সাময়িক অভিগমন, গ্রাম-নগর ও নগর-গ্রাম অভিগমন এবং আন্ত:আঞ্চলিক অভিগমন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আভ্যন্তরীণ অভিগমন প্রক্রিয়াগতভাবে অবশ্যই একটি দেশের রাজনৈতিক সীমানার ভিতরে ঘটে থাকে।

বোগ-এর দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী অভিগমনের মূল কারণের প্রায় সবই আন্তর্জাতিক অভিগমনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এদিক থেকে আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক অভিগমনের কারণের মধ্যে তেমন কোন তারতম্য নেই। কিন্তু এদের মধ্যে প্রধান প্রক্রিয়াগত পার্থক্য এই যে, আন্তর্জাতিক অভিগমন দুই বা ততোধিক দেশের রাজনৈতিক সীমানার বাইরে ঘটে থাকে- অর্থাৎ অভিগমনকারীকে নিজ দেশ ত্যাগ করে লক্ষ্যস্থল হিসেবে অপর একটি দেশে অন্তত: নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গমন করতে হবে। আন্তর্জাতিক অভিগমনের মুখ্য কারণ প্রধানত: অর্থনৈতিক। তবে সাম্প্রতিককালে রাজনৈতিক, ভূ-রাজনৈতিক, সাম্প্রদায়িক, এমন কি আদর্শিক কারণও আন্তর্জাতিক অভিগমনের ক্ষেত্রে গুরুত্বলাভ করছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ৩.৫

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন:

১ সত্য হলে 'স' মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন:

১.১. আভ্যন্তরীণ অভিগমন প্রক্রিয়াগতভাবে অবশ্যই একটি দেশের রাজনৈতিক সীমানার ভিতরে ঘটে থাকে।

১.২. বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলাসমূহে ঝুম চাষে অভ্যস্ত আদি জনগোষ্ঠী আন্ত:আঞ্চলিক শ্রেণীর অভিগমনের অন্তর্গত।

১.৩. প্রায় সকলদেশে গ্রাম-নগর অভিগমন সব সময়ে সরাসরি ঘটে থাকে।

১.৪. নগর থেকে গ্রামে অভিগমন উন্নতদেশে অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক ধারা বলা যেতে পারে।

১.৫. ভ্রাম্যমানতা কেন্দ্রিক অভিগমন প্রধানত: পাশ্চাত্যদেশসমূহে বিভিন্ন প্রবৃদ্ধি কেন্দ্র বিকাশের সাথে শ্রমিক অভিগমণে যুক্ত ছিল।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১. অভিগমন কাকে বলে? কত প্রকার ও কি কি?

২. আভ্যন্তরীণ অভিগমন কাকে বলে? বিভিন্ন প্রকার আভ্যন্তরীণ অভিগমন উল্লেখ করুন।

৩. আন্তর্জাতিক অভিগমন কাকে বলে? বিভিন্ন প্রকার আন্তর্জাতিক অভিগমন কি কি?

রচনামূলক প্রশ্ন:

১. অভিগমন প্রধানত কত প্রকার এবং কি কি? আন্তর্জাতিক অভিগমনের কারণসমূহ আলোচনা করুন।

২. অভিগমনকে প্রধানভাগে ভাগ কর এবং আভ্যন্তরীণ অভিগমনের কারণসমূহ আলোচনা করুন।

৩. বোগ-প্রণীত অভিগমনের কারণসমূহ নির্দেশ করুন। একজন ভূগোলবিদ এই কারণসমূহ কেন গ্রহণযোগ্য মনে করেন?

পাঠ-৩.৬ অভিগমনের সামগ্রিক শ্রেণীতত্ত্ব

এই পাঠ শেষে আপনি-

- অভিগমনের সামগ্রিক শ্রেণীতত্ত্ব সম্পর্কে ধারনা লাভ করবেন।

পূর্বের পাঠে আমরা লক্ষ্য করছি যে, অভিগমন প্রক্রিয়া, আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক, উভয়ই বহুবিধ কারণে হতে পারে এবং ক্রিয়াশীল উপাদানগুলি অনেক ক্ষেত্রে অত্যন্ত জটিল। এ কারণে, একটি দেশের জনসংখ্যা পরিবর্তন ও বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অভিগমন সব সময়েই একটি বিশেষ উপাদান হিসেবে বিবেচ্য হয়ে থাকে। এ সমস্ত উপাদান সর্বক্ষেত্রে সনাতন দৃষ্টিভঙ্গি - অর্থাৎ আকর্ষণ-বিকর্ষণ-এর দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। এক্ষেত্রে অভিগমনকারীদের উদ্ভাবনী দৃষ্টিভঙ্গি বা আকাঙ্খা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনার বিষয় বটে। এই দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে পেটারসেন (১৯৫৫) অভিগমন ব্যাখ্যায় ক্রিয়াশীল প্রক্রিয়াসমূহ একটি শ্রেণীতত্ত্বের কাঠামোর মধ্যে বিবৃত করেছেন। এই শ্রেণীতত্ত্বটি নিম্নরূপ:

সারণী ৩.৬.১: অভিগমনের শ্রেনীতত্ত্ব:

মিথস্কিয়ার ধরণ	অভিগমনের কারণ	অভিগমনের শ্রেণী	অভিগমনের	রূপ/ উদ্ভাবনী
	বাধ্যবাধকতা		ধরণ/সনাতন	
প্রকৃতি ও মানুষ	বাস্তব্যজনিত চাপ	প্রাচনী	ভ্রাম্যমানতা	আবাসভূমি ত্যাগ
রাষ্ট্র ও মানুষ	অভিগমন নীতি	উদ্দেশ্য প্রণোদিত বাধ্যকর	বিতাড়ন স্থানচ্যুতি	কুলী/শ্রমিক সরবরাহ
				দাস ব্যবসা
মানুষ ও দৃষ্টিভঙ্গির উচ্চাকাঙ্খা	উচ্চাকাঙ্খা	মুক্ত	গোষ্ঠীগত	অভিযাত্রিক
মানুষ ও সংঘবদ্ধ আচরণ	সামাজিক গতিধারা	দলবদ্ধ	জনপদ গঠন	নগরায়ন

আধুনিককালের অভিগমনসমূহকে প্রধানত বিভিন্ন সংস্থা পরিসংখ্যানগত শ্রেণীবিভাজন করে থাকে। এই শ্রেণীবিভাজনে বাহ্যত: কোন তত্ত্বীয় প্রেক্ষিত থাকে না। কিন্তু উপরোক্ত অভিগমন শ্রেনীতত্ত্বটিতে প্রায় সকল তত্ত্বীয় প্রেক্ষিতের ভিত্তি পাওয়া যায়, যার মধ্যে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শুরু করে বহুধা আর্থ-সামাজিক উপাদান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

পূর্বের পাঠে দেখা গেছে যে, জনসংখ্যা পরিবর্তন নির্ভর করে জন্ম ও অভিগমনসৃষ্ট আগমন বা অভিবাসনের ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং মৃত্যু ও অভিবাসন সৃষ্ট বহির্গমণের ফলে জনসংখ্যা হ্রাসের পার্থক্য বা অনুপাতের উপর। উভয় প্রক্রিয়ার ভারসাম্য থাকলে জনসংখ্যা স্থিতিশীল অর্থাৎ জনসংখ্যার কোন পরিবর্তন হয় না। পক্ষান্তরে, জনসংখ্যা হ্রাসের চেয়ে পরিপূরণ বেশী হলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়, আবার পূরণের চেয়ে অপচয় হলে জনসংখ্যা হ্রাস পায়। কাজেই জনসংখ্যা পরিবর্তনের মূল উপাদান হলো: প্রজননশীলতা, মরণশীলতা এবং অভিগমন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, অভিগমন নীতির বিভিন্ন বিধি-নিষেধ ও প্রতিবন্ধকতার কারণে, বিশেষ করে বিকাশশীল দেশ থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অভিগমন দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। ফলে এসব দেশে আন্তর্জাতিক অভিগমন বা বহিগর্মন জনসংখ্যা পরিবর্তনে (হ্রাস বা বৃদ্ধি) তেমন কোন ভূমিকা রাখছে না। দক্ষিণ এশীয় দেশসমূহ এরূপ পরিস্থিতির উদাহরণ। এরূপ ক্ষেত্রে প্রজননশীলতা এবং মরণশীলতার পার্থক্য জনসংখ্যা পরিবর্তনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। এই ধরনের জনমিতিক পরিস্থিতিতে কোন দেশের বা জনগোষ্ঠীর জন্ম হার ও মৃত্যু হার যথাক্রমে স্থূল জন্ম হার ও স্থূলমৃত্যুহারের পার্থক্য নির্ণয় করে শতকরা হারে জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধিহার (Natural Growth) নির্ণয় করা হয়।

সারণী ৩.৬.২: জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধি হারের আঞ্চলিক ধরা ২০০৮

জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধিহারের (বার্ষিক শতাংশ) বিশ্ব আঞ্চলিক ধারা, ২০১০			
বিশ্ব:	১.৫	উত্তর আমেরিকা:	০.৭
উন্নত বিশ্ব	০.২	যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা	০.৭
বিকাশশীল বিশ্ব	১.৮	ল্যাটিন আমেরিকা:	১.৯
আফ্রিকা:	২.৮	মধ্য আমেরিকা	২.৩
উপ-সাহারা অঞ্চল	৩.০	ক্যারিবীয় অঞ্চল	১.৫
উত্তর আফ্রিকা	২.৪	দক্ষিণ আমেরিকা	১.৮
পশ্চিম আফ্রিকা	৩.১	এশিয়া:	১.৮
পূর্ব আফ্রিকা	৩.০	পশ্চিম এশিয়া	২.৪
মধ্য আফ্রিকা	২.৯	দক্ষিণ এশিয়া	২.১
দক্ষিণ আফ্রিকা	২.৩	দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া	১.৯
ওশানিয়া :	১.২	পূর্ব এশিয়া	১.০
অস্ট্রেলিয়া	০.৮	ইউরোপ:	-০.১
নিউজিল্যান্ড	০.৯	উত্তর ইউরোপ	০.২
প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল	২.০	পশ্চিম ইউরোপ	০.১
		পূর্ব ইউরোপ	-০.৩
		দক্ষিণ ইউরোপ	০.১

উৎস : World Bank Development Report 2008.

উপরের ছক অনুযায়ী দেখা যায় যে, বিশ্বব্যাপী অঞ্চল ভেদে জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। এই রূপ পার্থক্য বিভিন্ন অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহের মধ্যেও রয়েছে। এইরূপ দেশ বা জনগোষ্ঠীগত বা আঞ্চলিক পার্থক্যের কারণ সংশ্লিষ্ট দেশ বা অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশ এবং স্বাস্থ্য ও প্রজননশীলতা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কযুক্ত। অপরদিকে, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা প্রযুক্তির দ্রুত বিস্তার ও হস্তান্তরের ফলে বহু বিকাশশীল দেশের জন্ম হার ও মৃত্যু হার দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে এবং ফলে জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধি হারও হ্রাস পাচ্ছে। সম্প্রতি দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ায় এ ধরণের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে প্রায় তিন দশক আগে যেখানে বাংলাদেশের জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধিহার ৩.০ ছিল বর্তমানে তা হ্রাস পেয়ে ২.১- এ দাড়িয়েছে। এক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা প্রযুক্তি বিকাশের সাথে সাথে আর্থ-সামাজিক উন্নতির বিষয়টি জড়িত নি:সন্দেহে।

পাঠসংক্ষেপ:

অভিগমন প্রক্রিয়া, আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক, উভয়ই বহুবিধ কারণে হতে পারে এবং ক্রিয়াশীল উপাদানগুলি অনেক ক্ষেত্রে অত্যন্ত জটিল। এ কারণে, একটি দেশের জনসংখ্যা পরিবর্তন ও বৃদ্ধির

ক্ষেত্রে অভিগমন সব সময়েই একটি বিশেষ উপাদান হিসেবে বিবেচ্য হয়ে থাকে। এ সমস্ত উপাদান সর্বক্ষেত্রে সনাতন দৃষ্টিভঙ্গি - অর্থাৎ আকর্ষণ-বিকর্ষণ-এর দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। এক্ষেত্রে অভিগমনকারীদের উদ্ভাবনী দৃষ্টিভঙ্গি বা আকাঙ্খা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনার বিষয় বটে। এই দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে পেটারসেন (১৯৫৫) অভিগমন ব্যাখ্যায় ক্রিয়াশীল প্রক্রিয়াসমূহ একটি শ্রেণীতত্ত্বের কাঠামোর মধ্যে বিবৃত করেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৩.৬

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. শূন্যস্থান পূরণ করুনঃ

১.১. অভিগমন প্রক্রিয়া, আভ্যন্তরীণ ও -------, উভয়ই বহুবিধ কারণে হতে পারে।

১.২. আধুনিককালের অভিগমনসমূহকে প্রধানত: বিভিন্ন সংস্থা -------গত শ্রেণীবিভাজন করে থাকে।

১.৩. জনসংখ্যা পরিবর্তনের মূল উপাদান হলো: প্রজননশীলতা. ------- এবং অভিগমন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১. অভিগমনের শ্রেণীতত্ত্ব কি?

২. জনসংখ্যা পরিবর্তন কিসের অনুপাতের উপর নির্ভর করে?

৩. আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অভিগমন দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে কেন?

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. অভিগমনের শ্রেণীতত্ত্ব বলতে কি বুঝায়? পেটারসেন প্রণীত অভিগমন শ্রেণীতত্ত্ব পর্যালোচনা করুন।

২. এই পাঠের শেষাংশে বর্ণিত তথ্যসারি অনুযায়ী বিশ্ব জনসংখ্যা বৃদ্ধি ধারা আলোচনা করুন।

পাঠ-৩.৭ জনসংখ্যা বৃদ্ধিঃ ঐতিহাসিক ধারা

এই পাঠ শেষে আপনি-

- জনসংখ্যা বৃদ্ধির ঐতিহাসিক ধারা সম্বন্ধে জানতে পারবেন।

পূর্বের পাঠে জনসংখ্যা পরিবর্তনের উপাদান এবং বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করা হয়েছে। আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির মূল উপাদান হচ্ছে প্রজননশীলতা, মরণশীলতা এবং অভিগমন। বিশ্বে

বর্তমান আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় জনসংখ্যা পরিবর্তনে অভিগমনের ভূমিকা অপেক্ষাকৃত সীমিত। তাই জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে প্রজননশীলতা ও মরণশীলতা তথা যথাক্রমে কোন দেশের বা জনগোষ্ঠীর জন্ম হার ও মৃত্যু হার বিশেষ গুরুত্ববহ।

ঐতিহাসিক ধারা

বিশ্ব জনসংখ্যা বৃদ্ধির ঐতিহাসিক ধারা কেবল জন্মহারের উপর নির্ভরশীল নয় -এক্ষেত্রে মৃত্যুহারের পরিবর্তন বিশেষ গুরুত্ববহ। প্রায় ২(দুই) মিলিয়ন বৎসর পূর্বে মানব-পূর্ব পুরুষ (অস্ট্রেলোপিথেকাস এবং জ্ঞাতিসমূহ) মোটামুটি পূর্ব আফ্রিকায় সংঘবদ্ধ ছিল। এদের সংখ্যা প্রায় ১২৫,০০০ জন ছিল মাত্র। এদের অধস্তন পুরুষদের মধ্যে যখন 'সংস্কৃতি'র সংস্পর্শ শুরু হয় তখন অজৈবিক তথ্যমালা বংশ পরম্পরায় বিস্তার লাভ করতে থাকে, যে ধারা এখনও মানুষের মধ্যে বহমান। অবশ্য এই ধারাবাহিকতার পদ্ধতি ও মাধ্যমের যথেষ্ট উন্নতি, বিকাশ, উৎকর্ষ এবং গতির পরিবর্তন ঘটেছে। তবে মানব সংস্কৃতির প্রকাশমান বিকাশ প্রায় ২০০,০০০ বৎসর পূর্বে ঘটে যখন মানুষের বিবর্তন জনগোষ্ঠীরূপে বিভিন্ন মহাদেশে বিস্তার লাভ করে। এই দীর্ঘ সময়কাল মানুষের জন্ম হার প্রতি হাজারে ৫০-এর মত ছিল। প্রাচীন সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ কৃষি প্রযুক্তির আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত মৃত্যু হার ও জন্মহারের কাছাকাছি ছিল। ফলে, অনুমিত গড় বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধিহার মাত্র ০.০০২ শতাংশ ছিল। ফলে খৃষ্টপূর্ব ৮০০০ সালে বিশ্ব জনসংখ্যা প্রায় ৫ মিলিয়নে দাঁড়ায়। মানুষ তখন খাদ্য সংগ্রাহক ছিল। এই খাদ্য অনুসন্ধান এবং পরিবেশগত বাধ্যবাধকতার কারণে মানুষ এই সময় বিভিন্ন মহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং অভিগমনে বাধ্য হয়।

কৃষির প্রথম উদ্ভব এবং পশুপালন কখন এবং কোথায় শুরু হয় সে সম্পর্কে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। তবে প্রাচীন সংস্কৃতি কেন্দ্রসমূহ যেখানে অনুকূল উদ্ভিদ বিকাশের ভৌগোলিক ও পরিবেশগত অবস্থা বিরাজ করতো (যেমন, আর্দ্র-উষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলের নদী অববাহিকা) সেখানেই কৃষির উদ্ভব ও পশুপালন সংস্কৃতি শুরু হয় তা এখন নিশ্চিত। মধ্যপ্রাচ্য বা পশ্চিম এশিয়ার প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত যে এই অঞ্চলে খৃষ্টপূর্ব ৭০০০ থেকে ৫৫০০ সময়কালে কৃষি ভিত্তিক গ্রামীন জনপদ গড়ে ওঠে। এই প্রমাণ থেকে অনুমিত হয় যে, কৃষি জীবিকার পত্তন অন্তত: ৯০০০ থেকে ৭০০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে শুরু হয়েছিল। আর কৃষি অনুকূল অঞ্চলে মানব বসতের সাথে সাথে জনসংখ্যার বিকাশ ঘটেছিল।

উপরোক্তের আলোকে তৎকালীন জনসংখ্যা বহুল অঞ্চল হিসেবে ইউফ্রেতিস-টাইগ্রীস অববাহিকা (বর্তমানে ইরাক ও ইরানের দক্ষিণাংশ), নীলনদ অববাহিকা (বর্তমানে মিশর) সিন্ধু অববাহিকা (দক্ষিণ পাকিস্তান) এবং গাঙ্গেয় অববাহিকা (উত্তর ও উত্তর-পূর্ব দক্ষিণ এশিয়া, উত্তর ভারত ও উত্তর-পশ্চিম বাংলাদেশ) চিহ্নিত করা যায়। কালক্রমে এই সমস্ত জনগোষ্ঠী কৃষি থেকে প্রয়োজনের তাগিদে অন্যান্য কর্মকান্ড গ্রহণ করে। চাকার আবিষ্কার, ধাতব দ্রব্যের ব্যবহার (বিশেষ করে তামা, লোহা এবং কাসা) মানব কর্মকান্ডে বৈচিত্র্য আনে। একই সাথে বিনিময় পদ্ধতির বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে এবং সামাজিক এবং রাজনৈতিক ভিত্তির সৃষ্টি হয়। তবে একাধিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রোগ এবং সাময়িক খাদ্যভাব মানুষের আয়ুষ্কাল সে সময় অতি নিম্ন পর্যায়ে রাখে- ২৫ থেকে ৩০ বৎসর পর্যায়ে।

আদি মানব সভ্যতা প্রাচীন জনবসত কেন্দ্রগুলিতেই গড়ে উঠে। উপরোক্ত কারণে এসময়ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার অতি শ্লথ ছিল। যীশুখৃষ্টের জন্মের প্রাক্কালে জনসংখ্যা মাত্র ২০০ থেকে ৩০০ মিলিয়নের মধ্যে ছিল। এরপর জনসংখ্যা দ্বিগুন হতে প্রায় ১৬০০ বৎসর সময় লেগেছিল। এরূপ মন্থর জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ উপর্যুপরি একাধিক মহামারী ও দুর্ভিক্ষের প্রকোপ। ১৩৪৮ - ৫০ সালের মধ্যে মাত্র দুই বৎসরে

ইউরোপের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৫ শতাংশ মানুষ প্লেগ রোগে মারা যায়। একমাত্র ইংল্যান্ডে ১৩৪৮-৭৯ সালের মধ্যে জনসংখ্যা ৩.৮ মিলিয়ন থেকে কমে ২.১ মিলিয়নে দাঁড়ায়। একটি তথ্যানুসারে ১০ থেকে ১৮৪৬ খৃস্টাব্দের মধ্যে ইংল্যান্ডে ২০০ টি দুর্ভিক্ষের ঘটনা ঘটে। পক্ষান্তরে পরবর্তী ২০০ বৎসর বিশ্ব জনসংখ্যা দ্বিগুন হয়ে ১৮৫০ সালে ১.০ মিলিয়নে দাঁড়ায়। এই সময়কালে সামুদ্রিক অভিযান এবং নতুন দেশ/মহাদেশ আবিষ্কারের ফলে প্রধানত: ইউরোপীয় ও মধ্যপ্রাচ্য দেশসমূহ থেকে জনগোষ্ঠী বিভিন্ন মহাদেশে বিস্তৃত হওয়ার সুযোগ পায়। এতে বিশেষ করে শিল্পোন্নত ইউরোপের শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের যেমন সরবরাহ নিশ্চিত হয় তেমনি পণ্যের নতুন বাজার সৃষ্টি হয়। এই সময় নগরীয় সংস্কৃতির বিকাশ, চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতি জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

এই ধারা পরবর্তী সময়ে অক্ষুন্ন থাকে এবং পরবর্তী মাত্র ৮০ বৎসরের বিশ্ব জনসংখ্যা আবার দ্বিগুন হয়ে ২.৬ মিলিয়নে দাঁড়ায় (১৯৩০)। তবে মহামারী ও দুর্ভিক্ষ এ সময় কালেও বিশ্ব জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে

সারনি ৩.৭.১: বিশ্ব জনসংখ্যার বিবর্তন

বিশ্ব জনসংখ্যার বিবর্তন	
প্রাগৈতিহাসিক যুগ : ৬০০০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে	১,২৫,০০০
ঐতিহাসিক সময়কাল : যীশু খৃষ্টের জন্মকালে	২০০ থেকে ৩০০ মিলিয়ন
মধ্যযুগ : ১৬৫০ খৃষ্টাব্দ	৫০০ মিলিয়ন
আধুনিক যুগ : ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ	১.০ বিলিয়ন
বর্তমানকাল : ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ	২.৬ বিলিয়ন
যুদ্ধোত্তর কাল : ১৯৭০ খৃষ্টাব্দ	৩.৪ বিলিয়ন
জনসংখ্যা বিস্ফোরণ ও জনসংখ্যা পরিকল্পনা কাল: ১৯৮০	৪.৫ বিলিয়ন
পরিকল্পিত পরিবার কাল: ১৯৯৫	৫.৭ বিলিয়ন
বর্তমান : ২০১০	৬.৯ বিলিয়য়ন
১৬৫০ সালের পূর্ব জনসংখ্যা তথ্য অনুমান ভিত্তিক।	

নেতিবাচক প্রভাব রাখে। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই ধারা বলবৎ ছিল। যদিও ১৮৫০-এর পরবর্তী সময় জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে গতি সঞ্চার হয় কিন্তু বৃদ্ধির হারে প্রধানত: দুর্ভিক্ষ এবং আঞ্চলিক খাদ্যভাব নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল। এর মধ্যে, খাদ্যভাবে রাশিয়ায় ১৯১৮-২২ এবং ১৯৩২-৩৪ সালে ৫ থেকে ১০ মিলিয়ন লোকের মৃত্যু ঘটে। ১৯২০-২১ সালে চীনে ৪ মিলিয়ন লোকের মৃত্যু ঘটে দুর্ভিক্ষের কারণে। একই কারণে ১৯৪৩ তৎকালীন বাংলায় ২ থেকে ৪ মিলিয়ন লোকের মৃত্যু ঘটে। এ সমস্ত কারণে মৃত্যু হার বৃদ্ধি সাময়িকভাবে জনসংখ্যা হ্রাস ঘটায়। প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পরবর্তী কাল পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বৎসরে ১.৫ শতাংশের উপরে কখনও ছিল না।

একইভাবে যুদ্ধবিগ্রহের কারণে মৃত্যুহার বৃদ্ধিতে বিশেষ করে ইউরোপ মহাদেশে জনসংখ্যার উপর যথেষ্ট নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। ইউরোপে খৃষ্টান জনগোষ্ঠীর মধ্যে ১৩৩৭-১৪৫৩ সালের শতবর্ষ যুদ্ধ এবং বিশেষ করে ১৬১৮–৪৮-এর ত্রিশবর্ষ যুদ্ধ মহাদেশের মৃত্যু হার কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে। একমাত্র শেষোক্ত যুদ্ধেই ক্যাথলিকগণ জার্মানী ও বোহমিয়ার জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ বা ২০,০০০ জন লোকের মৃত্যু ঘটায়। এর পরবর্তী সময়কাল অর্থাৎ প্রথম মহাযুদ্ধ (১৯১৮) পর্যন্ত ইউরোপে স্থিতিশীলতা ও শিল্পোন্নয়ন

জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখে। ইউরোপীয় শিল্প বিপ্লবের পর পরই বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক পরিবর্তন, কৃষি বিপ্লব এবং অভিগমন ধারার বিকাশ জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য অনুকূল ছিল। যুদ্ধ-বিগ্রহের মতই দুর্ভিক্ষও একই সাথে কম ছিল।

একই সময়ে বিশ্বে অপর জনঅধ্যুষিত মহাদেশ এশিয়ায় ভিন্নতর অবস্থা লক্ষ্যণীয়। ১৬৫০-১৭৫০ সালে এশিয়ার জনসংখ্যা ৫০ থেকে ৭৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। বৃদ্ধির হার অপেক্ষাকৃত চীনে অধিক ছিল। ১৬৪৪ সালে মিঙ রাজত্বের অবসান, পরবর্তীতে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং মানচু রাজাদের নতুন কৃষি নীতির ফলে চিনে মৃত্যু হার যথেষ্ট কমে যায়। কিন্তু এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে বিশেষ করে ভারত উপমহাদেশে এই সময় মোঘল সাম্রাজ্যের ক্রান্তিলগ্নে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিরাজ করছিল। ১৭০৭ সালে সম্রাট আরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর পরই সমগ্র ভারত আভ্যন্তরীণ যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং স্থানীয় দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে। যখন চীনে মানচু রাজাদের পৃষ্ঠাপোষকতায় কৃষি বিপ্লব ঘটছে তখন সমগ্র ভারত স্থানীয় রাজা, বৃটিশ এবং ফরাসীদের শক্তি পরীক্ষার ক্ষেত্র হিসেবে রূপ লাভ করে। যদিও বৃটিশ উপনিবেশবাদ ১৭৬৩ সালে অবশেষে রাজত্ব করার সুযোগ পায়, কিন্ত সামগ্রিক স্থিতিশীলতার অভাবে জনসংখ্যার বিস্তৃতি তেমন ঘটে নাই। বরং ১৭৭০ সালের এক দুর্ভিক্ষের ফলে ভারতের শস্যভান্ডার বাংলায় ১৭ মিলিয়ন জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের মৃত্যু ঘটে।

পাঠসংক্ষেপ:

জনসংখ্যা বৃদ্ধির মূল উপাদান হচ্ছে প্রজননশীলতা, মরণশীলতা এবং অভিগমন। সাধারণভাবে, ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও জনমিতিক দৃষ্টিকোণ থেকে জনসংখ্যা 'বৃদ্ধি'-এর প্রবণতা সর্বদা লক্ষ্য করা যায়। এর আলোকে জনমিতিক পরিমাপ সম্পর্কে দীর্ঘ বক্তব্যের পরিবর্তে বিশ্ব পর্যায়ে জনসংখ্যা বিবর্তনের ঐতিহাসিক ধারা আলোচনা এই অধ্যায়ের মূল উদ্দেশ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ৩.৭

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন:

১. শূন্যস্থান পূরণ করুন:

১.১. জনসংখ্যা বৃদ্ধির মূল উপাদান হচ্ছে -------, মরণশীলতা এবং অভিগমন।

১.২. বিশ্ব জনসংখ্যা বৃদ্ধির ঐতিহাসিক ধারা কেবল জন্মহারের উপর নির্ভরশীল নয় -এক্ষেত্রে মৃত্যুহারের ------- বিশেষ গুরুত্ববহ।

১.৩. প্রাচীন সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ কৃষি প্রযুক্তির আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত মৃত্যু হার ও জন্মহারের ------- ছিল।

১.৪. আদি মানব সভ্যতা ------- জনবসত কেন্দ্রগুলিতেই গড়ে উঠে।

১.৫. ১৬৫০-১৭৫০ সালে এশিয়ার জনসংখ্যা ৫০ থেকে ------- শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১. কৃষির প্রথম উদ্ভব এবং পশুপালন কখন এবং কোথায় শুরু হয়েছিল?

২. বিশ্ব জনসংখ্যা বিবর্তনে মূল পর্যায়গুলো কি কি?

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. জনসংখ্যা বৃদ্ধি বলতে কি বুঝ? জনসংখ্যা বৃদ্ধির ঐতিহাসিক ধারার প্রতি আলোকপাত করুন।

২. জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে জনসংখ্যা বিবর্তন পর্যায়সমূহ পর্যালোচনা করুন।

পাঠ-৩.৮ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার ও জনসংখ্যা আকার

এই পাঠ শেষে আপনি-

- জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার ও জনসংখ্যা আকার; এবং
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির পর্যায়সমূহের একটি তত্ত্বীয় কাঠামো সম্পর্কে ধারনা লাভ করবেন।

১৬৫০ থেকে ১৭৫০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে বিশ্ব জনসংখ্যার বার্ষিক বৃদ্ধিহার ছিল ০.৩ শতাংশ। পরবর্তী একশত বৎসর অর্থাৎ, ১৭৫০ থেকে ১৮৭০ সালে এই হার ০.৫ শতাংশ ছিল। এই সময় ইউরোপ মহাদেশের জনসংখ্যা দ্বিগুন হয়। পূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, এর পেছনে দ্রুত কৃষি প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনার উন্নতি, শিল্প বিপ্লবের ফলে পারিবারিক পর্যায়ে ইতিবাচক আর্থ-সামাজিক প্রভাব এবং

এই সময়কালের শেষের দিকে গুটি বসন্ত রোগের প্রতিশেধক আবিষ্কারসহ সামগ্রিক স্বাস্থ্য-সেবা ও চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতি সমষ্টিগতভাবে ক্রিয়াশীল ছিল। একই সাথে আঞ্চলিক জনসংখ্যার চাপ কমাতে আন্ত:মহাদেশীয় অভিগমন, বিশেষ করে আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির উপর ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। এই দুই মহাদেশের (নতুন বিশ্ব) জনসংখ্যা ১৭৫০ থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যে ১২ মিলিয়ন থেকে ৬০ মিলিয়নে দাঁড়ায়। এশিয়া মহাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি ইউরোপের চাইতে ধীর গতি সম্পন্ন ছিল– প্রায় ০.২৫ শতাংশ হারে। এই হার ইউরোপীয় পর্যায়ে পৌঁছাতে এশীয় দেশসমূহের আরও ৫০ থেকে ৭০ বৎসর লেগেছিল।

আফ্রিকার জনসংখ্যা বৃদ্ধি সম্পর্কে তথ্যের অভাব রয়েছে। তবে মনে করা হয় যে, পরিবেশগত কারণে রোগ-শোকের প্রকোপ, খাদ্যাভাব এবং অনুন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কারণে ১৬৫০ থেকে ১৮৫০ সময়কালে জনসংখ্যা স্থির অবস্থায়, প্রায় ১০০ থেকে ১১০ মিলিয়নের মধ্যে ছিল। ইউরোপীয়দের সংস্পর্শে এবং উপনিবেশ স্থাপনের ফলে ১৮৫০ সাল থেকে জনসংখ্যা ধীর গতিতে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৫০ সালে ২০০ মিলিয়নে পৌঁছে।

সারনী ৩.৮.১: বিশ্ব জনসংখ্যার মহাদেশীয় বিবর্তন ধারা

বিশ্ব জনসংখ্যার (মিলিয়নে) মহাদেশীয় বিবর্তন ধারা, ১৮৫০-২০১০							
সাল	বিশ্ব	আফ্রিকা	উ: আমেরিকা	লেটিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান	এশিয়া	ইউরোপ	ওশানিয়া
১৮৫০	১১৩	৯৭	২৬	৩৩	৭০০	২৭৪	২
১৯৫০	২৫১	২০০	১৬৭	১৬৩	১৩৭৮	৫৭৬	১৩
১৯৯৫	৫৭০	৭২০	২৯৩	৪৮১	৩৪৫১	৭২৯	২৮
২০১০	৬৯০৮	১০৩৩	৩৫১.৭	৫৮৮.৬	৪১৬৬.৮	৭৩২.৮	৩৫.৮

১৮৫০ থেকে ১৯৫০ সালের সময়কালে বিশ্ব জনসংখ্যার বার্ষিক বৃদ্ধিহার ছিল ০.৮ শতাংশ। জনসংখ্যার আকার প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ১ বিলিয়ন থেকে প্রায় ২.৫ বিলিয়নে দাঁড়ায়। লক্ষ্যণীয় যে, একমাত্র এশিয়া মহাদেশের জনসংখ্যা এই সময় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায় নাই (ছকে দ্রষ্টব্য)। কিন্তু অন্যান্য মহাদেশে দ্বিগুণ (যেমন আফ্রিকা) থেকে ছয়গুণেরও বেশী (যেমন উত্তর আমেরিকা) জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে। এই সমস্ত দেশে আন্ত:মহাদেশীয় অভিগমন ছাড়াও অর্থনৈতিক উন্নতি, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বিকাশ এবং মহামারী দমন প্রধান কারণ বলে মনে করা হয়।

উপরোক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারাবাহিকতা পরবর্তী সময়কালে বিশ্বব্যাপী লক্ষ্য করা যায়। ১৯৫০-৬০ দশকে প্রথম বারের মত বিশ্ব জনসংখ্যার বার্ষিক বৃদ্ধি হার ১.৮ শতাংশে দাঁড়ায়। বিশ্বে এই শতাব্দীর জনসংখ্যার বৃদ্ধি পায়, যা মধ্য ১৭শ' শতাব্দীর জনসংখ্যার সমান। বর্তমানে প্রতি বৎসর ৬০ মিলিয়ন হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে ৬.৮ বিলিয়ন এবং ২০১৫ সালে ৮ বিলিয়নেরও বেশি বিশ্ব জনসংখ্যা দাঁড়াবে।

সারনি ৩.৮.২: বিশ্ব জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারা

জাতিসংঘের সূত্র অনুযায়ী বিশ্ব জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারা, ১৯৩০-২০২৫	
সাল	জনসংখ্যা (বিলিয়ন)
১৯৩০	১.৮১
১৯৪০	২.০১
১৯৫০	২.৫১
১৯৬০	৩.০১
১৯৭০	৩.৪০
১৯৮০	৪.৫০
১৯৯৫	৫.৭০
২০১০	৬.৮৯২
২০২৫	৮.৩১
প্রাক্কলিত জনসংখ্যা।	

জনসংখ্যা বৃদ্ধির পর্যায়সমূহের একটি তত্ত্বীয় কাঠামো :

বিশ্ব জনসংখ্যা বৃদ্ধি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, জনমিতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে একটি পর্যায়ক্রম (Stages) বা স্তর রয়েছে, যার সাথে প্রধানত: জন্ম ও মৃত্যু হারে হ্রাস-বৃদ্ধি জনিত ধারা জড়িত। আবার জন্ম ও মৃত্যু হারে হ্রাস-বৃদ্ধি কোন দেশের বা কোন অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নতির পর্যায়ের সাথে সম্পৃক্ত। এই জনমিতিক প্রক্রিয়ার পরিক্রম অবশ্য ইউরোপীয় জনসংখ্যা বৃদ্ধির আলোকে রচিত হলেও বর্তমানে ইউরোপীয় অবস্থা ৫০ থেকে ৭০ বছর বিরতিতে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার অনেক দেশের জন্য প্রযোজ্য। জনসংখ্যার এই পর্যায়ক্রমিক বৃদ্ধিকে 'জনমিতিক পরিবৃদ্ধিকাল তত্ত্ব বা ধারা' বলা হয়। এই তত্ত্ব অনুযায়ী বিশ্ব জনসংখ্যা বিবর্তন ধারার প্রাথমিক পর্যায়ে উচ্চ কিন্তু অস্থিতিশীল জন্ম হার ও মৃত্যু হার লক্ষ্য করা যায়। ফলে জনসংখ্যার প্রাকৃতিক বৃদ্ধিহার খুব কম হয় বা স্থবিরতা দেখা যায়। অনুন্নত অর্থনৈতিক অবস্থা, নিম্ন আয়ুষ্কাল, জন্ম ও মৃত্যুর নিয়ন্ত্রণহীনতা এবং নিম্ন পর্যায়ের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এই পর্যায়ের জনমিতিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। ১৬৫০ বা কোন দেশে ১৭৫০ সালে পর্যন্ত ইউরোপ মহাদেশে এই পরিস্থিতি বিরাজ করছে। এমন কি কয়েক দশক পূর্বেও আফ্রিকা, দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মধ্য আমেরিকার দেশসমূহের জনসংখ্যা বা জনমিতিক অবস্থা এই পর্যায়ে ছিল। স্থূল জন্ম হার ও স্থূল মৃত্যু হার উভয়ই এই স্তরে ৪০ থেকে ৫০ এর মধ্যে বিরাজ করে দ্বিতীয় পর্যায়ে জনমিতিক বৈশিষ্ট্য জনসংখ্যার উচ্চ বৃদ্ধির সাথে জড়িত। অর্থাৎ উচ্চ ও অপরিবর্তিত জন্ম হার এবং দ্রুত হ্রাসমান মৃত্যু হার এই পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য, ফলে জনসংখ্যার স্বাভাবিক বয়:কাঠামো অর্থাৎ জনসংখ্যার বয়:কাঠামোর নিম্ন পর্যায় সুপ্রশস্থ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়।

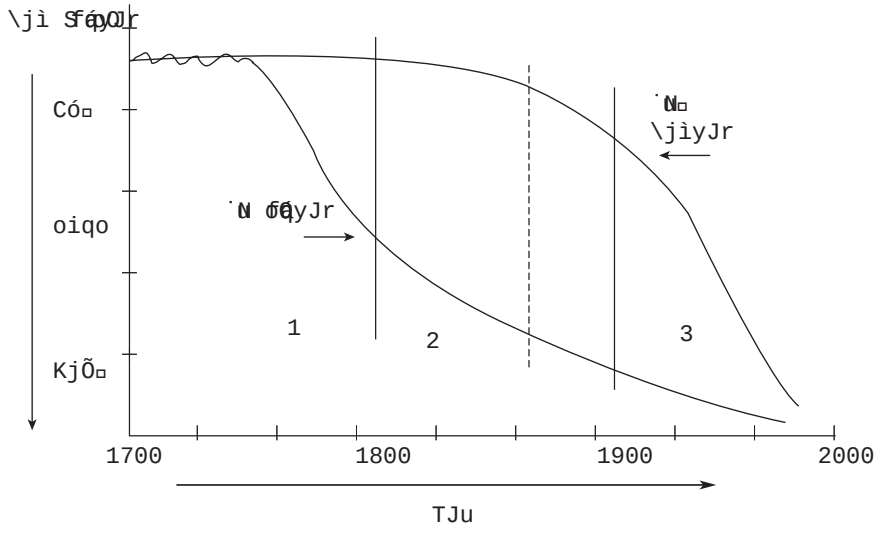

চিত্র ৩.৮.১: জনমিতিক পরিবৃত্তিকাল তত্ত্বের পর্যায় বা স্তরসমূহ

এতে শিশু জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫০ শতাংশ হয়ে থাকে এবং উচ্চ জনসংখ্যা বৃদ্ধির সম্ভাব্যতা প্রকাশ করে। ১৯ শতকের শেষের দিকে ইউরোপ ও আমেরিকার জনসংখ্যা পর্যায় এই স্তরে ছিল। বর্তমানে উত্তর ল্যাটিন আমেরিকা, মধ্য আমেরিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অংশ বিশেষ, দক্ষিণ এশিয়া এবং প্রায় পশ্চিম এশীয় মুসলিম দেশসমূহকে জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য বিচারে জনমিতিক পরিবৃত্তিকালের দ্বিতীয় স্তরে ফেলা যায়। এই পর্যায়ে স্থূল জন্ম হার ৩০ থেকে ৪০ এবং স্থূল মৃত্যু হার ২০ থেকে ৩০-এর মধ্যে অবস্থান করে। ফলে, জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধিহার অতি উচ্চ হয়-৩.০ থেকে ৪.০ শতাংশের মধ্যে।

দ্বিতীয় স্তরের শেষের দিকে কিছু কিছু দেশে মৃত্যু ও জন্ম হারের দ্রুত নিম্নগতি লাভ করতে পারে। সেক্ষেত্রে জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধি হার কিছুটা হ্রাস পায়। এরূপ দেশে স্থূল জন্ম ও মৃত্যু হার যথাক্রমে ৩০ এবং ১৫ হয়ে থাকে। ফলে স্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার ২.০০ থেকে ২.৫ হয়ে থাকে। ষাট দশকে দক্ষিণ ইউরোপীয় দেশসমূহ, যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, নিউজল্যান্ড এবং (সোভিয়েত) রাশিয়া এই জনমিতিক স্তরে অবস্থান করছিল। বর্তমানে থাইল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, ভারত, চীন প্রভৃতি দেশসমূহ এই জনমিতিক স্তরে রয়েছে।

সারণী ৩.৮.৩: জনমিত্তিক পরিবৃত্তিকাল তত্ত্বের পর্যায়সমূহ

জনমিতিক পরিবৃত্তিকাল তত্ত্বে পর্যায়সমূহের বৈশিষ্ট্য		
পর্যায়-১ :	উচ্চ জন্ম হার ও উচ্চ মৃত্যু হার	স্থূল জন্ম হার প্রায় ৪০ এবং স্থূল মৃত্যু হার ৩০-এর উর্ধ্বে।
পর্যায়-২:	(ক) উচ্চ জন্ম হার এবং ক্রম হ্রাস মান মৃত্যু হার (খ) মধ্যম-উচ্চ জন্ম হার এবং দ্রুত হ্রাসমান মৃত্যু হার	স্থূল জন্ম হার ৩০-৪০ এবং স্থূল মৃত্যু হার ১৫-২০। স্থূল জন্ম হার ৩০-এর নিচে এবং স্থূল মৃত্যু হার ১৫-এর নিচে।
পর্যায়-৩:	নিম্ন জন্ম হার এবং নিম্ন মৃত্যু হার	স্থূল জন্ম হার ২০-২৫ এবং স্থূল মৃত্যু হার ১০-১৫।

প্রায় সকল ইউরোপীয় দেশ এবং এশিয়া মহাদেশের জাপান ও সিঙ্গাপুর জনমিতিক পরিবৃত্তিকালের তৃতীয় স্তরে অবস্থান করছে। এই সমস্ত অঞ্চলে নিম্ন জন্ম ও মৃত্যু হার লক্ষ্য করা যায়, ফলে জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধি হারও অতি নিম্ন-প্রায় ১.০ শতাংশ এমন কি কোন কোন দেশে (যেমন, সিঙ্গাপুর, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি) ঋনাত্মক জনসংখ্যা বৃদ্ধি ধারাও লক্ষ্য করা গেছে। অতি উন্নত স্বাস্থ্য ও প্রজননশীলতা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, ক্ষুদ্র পরিবার আকার রক্ষার প্রবণতা, উচ্চ জীবনযাত্রা পর্যায়, বিলম্বিত বিবাহ প্রথা এমন কি বিবাহ পরিহার করার প্রবণতা এবং জনসংখ্যার বর্হিগমন এরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টির পেছনে ক্রিয়াশীল।

এই আলোচনায় বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, জনমিতিক পরিবৃত্তিকাল তত্ত্বে বিভিন্ন স্তরের স্থানিক ও কালীক ভিন্নতা বিভিন্ন দেশ বা অঞ্চলভেদে বিরাজ করে থাকে। নির্দিষ্ট স্তর বিশেষে জনসংখ্যার বৃদ্ধিগত ব্যাখ্যার এই স্থান ও কাল প্রেক্ষিতকে অবশ্যই গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

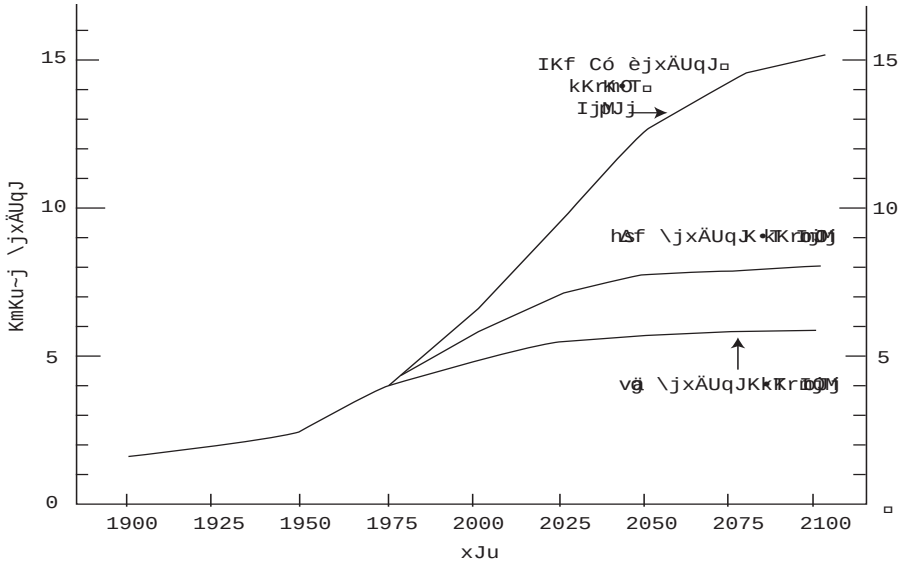

চিত্র ৩.৮.২: ফ্রেজাকার বিশ্ব জনসংখ্যা বৃদ্ধির (১৯০০-২১০০) তিন ধরণের পরিবৃত্তিক প্রাক্কলন।

উপরেরটি ছাড়াও জনসংখ্যা বৃদ্ধি সংক্রান্ত আরও তত্ত্ব রয়েছে। এর মধ্যে ম্যালথাস-এর 'অপ্রতিরোধ্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রতিক্রিয়া, হাং লিয়াং চি'র, অপ্রতিরোধ্য জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থা তত্ত্ব' 'ইষ্টিত জনসংখ্যা তত্ত্ব' এবং 'আশাবাদী-নিরাশাবাদী তত্ত্ব' উল্লেখযোগ্য। এই পর্যায়ে পাঠ বহির্ভূত বিধায় এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো না।

বর্তমানে যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি বিকাশশীল অঞ্চলে ঘটছে সে হারে ইউরোপীয় জনসংখ্যার কখনও বৃদ্ধি হয় নাই। এর অবশ্য প্রধান কারণ ঐতিহাসিকভাবে প্রথমবস্থায় উচ্চ জন্ম ও মৃত্যু হার এবং যখন মৃত্যু হার কমতে শুরু করে ঠিক তখনই আন্তঃ মহাদেশীয় অভিগমন প্রক্রিয়া দ্রুত প্রসার লাভ করে। এই ধারা বর্তমানকাল পর্যন্ত চলতে থাকে। ফলে যুক্তরাজ্যে জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধিহার এককালীন সর্বোচ্চ ১.৪ শতাংশ ছিল। স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশে এই হার ছিল ১.৩ শতাংশ। পক্ষান্তরে প্রায় বিকাশশীল দেশে এই হার দ্বিগুনেরও অধিক। এর প্রধান কারণ, মৃত্যু হার দ্রুত হ্রাস প্রাপ্তি । উদাহরণস্বরূপ, শ্রীলঙ্কায় ১৯৪৫ ও ১৯৫২ সালের মধ্যে মৃত্যু হার ২২ থেকে ১০-এ নেমে আসে। এর

প্রধান কারণ ম্যালেরিয়া রোগের নির্মূল। প্রায় দক্ষিণ এশীয় দেশে এই পরিস্থিতি ১৯৫০ ও ১৯৭০-এর মধ্যে ঘটে।

যদিও সাধারণভাবে আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্র ও স্বাস্থ্য প্রযুক্তিকে মরণশীলতা হ্রাসের প্রধান কারণ বলে মনে করা অর্থনৈতিক উন্নতি এবং সামাজিক ও শিক্ষাগত বিকাশ এর জন্য পরোক্ষভাবে দায়ী। এ কারণে বিশ্বের প্রায় অঞ্চলে, যেমন, ল্যাটিন আমেরিকা ও পূর্ব এশিয়ায়, জনমিতিক বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক বিকাশের মধ্যে একটা পরিষ্কার সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। তবে কৃষি নির্ভর কিছু দেশে এরূপ পরিবর্তন ধীরগতিতে ঘটছে। আফ্রিকা ও এশিয়ায়ও এরূপ উদাহরণ পাওয়া যায় (জন সংখ্যা বৃদ্ধিহার সংক্রান্ত ছক দ্রষ্টব্য)। ইউরোপের বাইরে পাশ্চাত্য ধারার জনসংখ্যা বৃদ্ধি কেবল জাপান ও সিঙ্গাপুরে দেখা যায়। দ্রুত শিল্পোন্নয়ন এবং অকৃষি অর্থনীতি বিকাশের সাথে সাথে সামাজিক উন্নয়ন ধারা এই পরিস্থিতির পেছনে ক্রিয়াশীল ছিল। অতি সম্প্রতি, তাইওয়ান, চীন এবং আরও কিছু দেশ এই ধারা অনুসরণ করছে। তবুও প্রায় বিকাশশীল অঞ্চলে ধনী ও দরিদ্র জনসংখ্যার মধ্যে অর্থনৈতিক দূরত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। কেননা, এ সব অঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে সমতা রক্ষা করতে পারছেনা। কোন কোন ধনী দেশের জন্য অর্থনৈতিক স্থবিরতা জনসংখ্যা ও উন্নয়ন ধারার মধ্যে অসামঞ্জস্য সৃষ্টি করছে। জনসংখ্যা পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি মোকাবেলার জন্য যথেষ্ট নয়। বর্তমান যুগে অভিগমন প্রক্রিয়ায় জনসংখ্যা চাপ বৃদ্ধি বা কমানো সম্ভব নয় পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এমতাবস্থায় বিশ্বের অঞ্চলসমূহের দীর্ঘমেয়াদী জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং উন্নয়ন ধারা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে। এইরূপ বিশ্লেষণে দেখা যাবে যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির নেতিবাচক প্রভাব একমাত্র বৃদ্ধি-হার হ্রাসের প্রচেষ্টার মধ্যেই নিহিত। এজন্য জনসংখ্যার আকার নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা একমাত্র উপায়। এই ব্যবস্থা সম্ভব একমাত্র বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থা সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত করা।

এই ব্যবস্থাপনার অগ্রগতি পাশ্চাত্য দেশসমূহে গ্রহণীয় হলেও অনেক দেশে গ্রহণযোগ্য হয় নাই (যেমন, পশ্চিম এশীয় মুসলিম দেশসমূহ) অথবা ধীর গতিতে ঘটছে (যেমন, পাকিস্তান ব্যতীত দক্ষিণ এশিয়ায়) এবং কোন কোন দেশে দ্রুত ঘটেছে (যেমন, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া)। পরিবার সীমিতকরণের এ ধরনের বিভিন্নতর সাথে শিক্ষিতের হার, শ্রম শক্তিতে মহিলাদের অংশ গ্রহণ হার, মহিলাদের ক্ষমতায়নে সামাজিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি এবং পরিবার পরিকল্পনা উপকরণের সহজলভ্যতা বা উপকরণ প্রাপ্যতাকে সামগ্রিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রভৃতি বিষয় জড়িত। এসমস্তের যথাযথ সমন্বয়সাধণ দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং এই বৃদ্ধির প্রতিক্রিয়াকে রোধ করতে পারে।

সারণী ৩.৮.৪: বিশ্ব জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হার

বিশ্ব জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হার, ১৯৯০-২১০০								
জনসংখ্যা (মিলিয়ন)					**অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিহার (বার্ষিক শতাংশ)**			
অঞ্চল	১৯৯০	২০২০	২০৫০	২১০০	১৯৫০-৯০	১৯৯০-২০০০	২০০০-৫০	২০৫০-২১০০
বিশ্ব	৫২৬২	৭৯২২	১০০৬৫	১০৭৬১	৪.০	২.৯	২.৯	২.৪
উপ-সাহারা আফ্রিকা	৪৮৮	১০৮০	১৬৯০	১৯২২	২.৭	৪.৩	৫.২	৪.২
পশ্চিম ইউরোপ	৪৩৪	৪৭৫	৪৬১	৩৯৫	৩.৭	২.০	১.৪	১.০

মধ্য-পূর্ব ইউরোপ	১২৪	১২৩	১১৬	৯৭	৩.৯	১.৮	৫.০	২.০
পূর্ব এশিয়া	১২৪২	১৬৫৪	১৮১৫	১৭৭৮	৬.১	৮.৪	৩.৮	২.২
দক্ষিণ এশিয়া	১১২৮	১৮৫৮	২৪০৫	২৩২৫	৪.৫	২.৮	৫.২	৪.২
রাশিয়া	২৮৯	৩১১	৩৩০	৩৫০	৫.২	০.৪	৫.৪	২.৮
ল্যা, আমেরিকাও ক্যারিবীয় অঞ্চল	৪৩৪	৬৯৮	৯২০	১০৮৫	৪.২	৩.৭	৩.৮	২.৭
মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা	২৭০	৫৮৫	৯৮৫	১৪২৪	৪.৬	৪.৮	৩.৬	৩.৬
উত্তর আমেরিকা	২৮১	৩৫৮	৪০৩	৪৬০	৩.৩	২.৩	১.৯	১.৬
ওশানিয়া	৫৭২	৭৮০	৯২৯	৯২৭	৮.০	৩.৯	২.৮	১.৬

উৎস : IIASA, Austria, 1999 অবলম্বনে

পাঠসংক্ষেপ:

এই পাঠে জনসংখ্যা বৃদ্ধি সংক্রান্ত নির্বাচিত কিছু বিষয় আলোচনা করা হবে। লক্ষ্য করুন যে, জনসংখ্যা 'পরিবর্তন' ও 'বৃদ্ধি' বাক্যদ্বয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। এই পাঠে 'বৃদ্ধি' কথাটি ব্যবহার হলেও বিষয়টি তত্ত্বীয়ভাবে জনসংখ্যা পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কীয়, কেননা, খুব কম দেশ বা জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যার হ্রাস বা নেতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। সাধারণভাবে, ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও জনমিতিক দৃষ্টিকোণ থেকে জনসংখ্যা 'বৃদ্ধি'-এর প্রবণতা সর্বদা লক্ষ্য করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ৩.৮

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন:

১. শূন্যস্থান পূরণ করুন:

১.১. ১৬৫০ থেকে ১৭৫০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে বিশ্ব জনসংখ্যার বার্ষিক বৃদ্ধিহার ছিল ---------- শতাংশ।

১.২. ১৯৫০-৬০ দশকে প্রথম বারের মত বিশ্ব জনসংখ্যার বার্ষিক বৃদ্ধি হার --------শতাংশে দাঁড়ায়।

১.৩. 'জনমিতিক পরিবৃদ্ধিকাল তত্ত্ব বা ধারা' অনুযায়ী বিশ্ব জনসংখ্যা বিবর্তন ধারার প্রাথমিক পর্যায়ে----------কিন্তু অস্থিতিশীল জন্ম হার ও মৃত্যু হার লক্ষ্য করা যায়।

১.৪. জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধিহার অতি উচ্চ হয়-৩.০ থেকে ----------শতাংশের মধ্যে।

১.৫. দ্বিতীয় স্তরের শেষের দিকে কিছু কিছু দেশ মৃত্যু ও জন্ম হারের দ্রুত --------লাভ করতে পারে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১. জনমিতিক পরিবৃদ্ধিকাল তত্ত্ব বা ধারা কাকে বলা হয়?

২. জনমিতিক পরিবৃদ্ধিকাল তত্ত্ব পর্যায় সমূহের বৈশিষ্ট্য কি কি?

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার ও জনসংখ্যা আকারের বিশ্ব পর্যায়ের সম্পর্ক নির্দেশ কর।

২. জনমিতিক পরিবৃত্তিকাল তত্ত্বটি আলোচনা কর।

৩. সংক্ষেপ বিশ্ব জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা কর।

পাঠ-৩.৯ জনসংখ্যা কাঠামোঃ বয়ঃকাঠামো

এই পাঠ শেষে আপনি-

- জনসংখ্যা কাঠামোর অন্তর্গত বয়ঃকাঠামো; এবং
- জনসংখ্যার কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পারবেন।

জনসংখ্যা কাঠামো বলতে কোন দেশের জনসংখ্যা বা কোন জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসমূহকে বুঝায়। বস্তুত: এ সমস্ত বৈশিষ্ট্য জনসংখ্যার গাঠনিক চরিত্রমাত্র। স্বাভাবিকভাবে একটি জনসংখ্যার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মানুষ থাকে, যেমন, নারী, পুরুষ, বিবাহিত, অবিবাহিত, বিভিন্ন বয়শ্রেণী সম্পন্ন, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, বিভিন্ন পেশা ইত্যাদি। এই ধরণের বৈশিষ্ট্য জনসংখ্যার কাঠামোগত অবয়ব সৃষ্টি করে থাকে।

এ সম্পর্কে জনসংখ্যার উপাদানের সাথে জনসংখ্যা কাঠামোর মূল বিভিন্নতা স্মরণ রাখতে হবে। উপাদান প্রধানত: জনসংখ্যার পরিবর্তনকারী বৈশিষ্ট্য, যেমন, জন্ম, মৃত্যু, অভিগমন এবং সম্পর্কীয় বিষয়াদি। জনসংখ্যা কাঠামো হচ্ছে একটি দেশের জনসংখ্যা বা জনগোষ্ঠীর বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য বা অবয়ব; জনসংখ্যা উপাদান হচ্ছে এর অন্ত:স্থ বৈশিষ্ট্য যা জনসংখ্যা পরিবর্তনে সরাসরি ভূমিকা পালন করে।

জনসংখ্যার কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য

জৈব বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কাঠামো : এ সমস্ত বৈশিষ্ট্য মানুষ জন্মসূত্রে অর্জন করে এবং জীবদ্দশায় অপরিবর্তিত থাকে। এই ধরনের বৈশিষ্ট্য প্রধানত: সাংস্কৃতিকভাবে অর্জন করা সম্ভব নয়। জনসংখ্যার নারী-পুরুষ কাঠামো, বয়:কাঠামো, বিভিন্ন নৃ-তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য যেমন, চুল বা গায়ের রং, বর্ণ/ জাতিগত বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি। এই বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জনসংখ্যা কাঠামোকে অনেক সময় অনার্জিত বা জৈব (Non-asribed or Biological) বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কাঠামো বলে।

অজৈব বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কাঠামো : জনসংখ্যার যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য মানুষ জন্মের পর সাংস্কৃতিকভাবে গ্রহণ বা অর্জন করে তাকে অজৈব বা অর্জিত (Non-biological or Ascribed) বৈশিষ্ট্য/কাঠামো বলে। এই কাঠামোভুক্ত জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো ভাষা, ধর্ম, পেশা বা কর্ম, শিক্ষা এবং বৈবাহিক অবস্থা।

লক্ষ্যণীয় যে উভয় শ্রেণীগত বিন্যাস জনসংখ্যার গুণগত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে এবং পরোক্ষভাবে জনসংখ্যার পরিবর্তন প্রক্রিয়া বা উপাদান সমূহকে প্রভাবিত করে থাকে। এ কারণে জনমিতিক প্রক্রিয়ার যথার্থ অনুধাবনে জনসংখ্যা কাঠামোর পর্যালোচনার বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে।

জনসংখ্যার কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য	
জৈব/অনার্জিত	**অজৈব/অর্জিত**
বয়:কাঠামো	শিক্ষা
লিঙ্গ কাঠামো	পেশা ও অর্থনৈতিক কাঠামো
বর্ণ বা জাতিগোষ্ঠী	বৈবাহিক অবস্থা
	ভাষা
	ধর্ম
	আবাসিকতা (গ্রাম ও শহর)

এ কারণে এই পাঠে জনসংখ্যা কাঠামো পর্যালোচনায় বিশ্ব পর্যায়ে বিভিন্নতার প্রতি গুরুত্ব অধিক প্রদান না করে বৈশিষ্ট্যের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে ছকে তারকা চিহ্নিত জনসংখ্যা কাঠামোগুলো আলোচনা করা হবে।

বয়:কাঠামো

জনসংখ্যার বয়:কাঠামো (অনেক সময় বয়:সংগঠন বা বয়:বিন্যাস বলে পরিচিত) তিনটি প্রধান কারণে জনসংখ্যা বিশ্লেষণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ: প্রথমত, বয়স মানুষের জন্মের সাথে সাথে ব্যক্তি সম্পর্কীয় একটি বৈশিষ্ট্য যার পরিবর্তন সমগ্র জীবদ্দশায় বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে; দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন বয়:শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত জনসংখ্যা নানাভাবে একটি দেশের জনমিতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাকে প্রভাবিত করে; তৃতীয়ত, উপরোক্ত দুইটি কারণ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের জন্য বয়:কাঠামোর তথ্যকে বিভিন্ন সূচক বা অনুপাতে পরিবর্তিত করে জনসংখ্যার গঠন পর্যালোচনার প্রয়োজন হয়।

একটি দেশের বা জনগোষ্ঠীর বয়:কাঠামো সরাসরি তিনটি জনমিতিক উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয় : মৃত্যু হার, জন্ম হার এবং অভিগমন। এই উপাদানগুলি প্রধানত বয়:কাঠামোর বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে যৌথভাবে কাজ করে এবং নির্দিষ্ট জনসংখ্যা বা দেশের আর্থ-সামাজিক পর্যায়ের উপর নির্ভরশীলও বটে। জনসংখ্যার বয়:কাঠামো সংক্রান্ত তথ্য আদমশুমারী উৎস থেকে প্রধানত পাওয়া যায়। এই তথ্য অনেক সময় নির্দিষ্ট বয়স বা বয়স-সীমার অবগননা বা অতিগননার কারণে ভ্রান্তিপূর্ণ হতে পারে। নিম্ন শিক্ষার হার, শুমারীর গুরুত্ব সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং কোন কোন সমাজে রক্ষণশীলতা এর প্রধান কারণ। ফলে নির্দিষ্ট বয়স কেন্দ্রিক (যেমন- ২০, ৩০, ৪০, ৫০ ইত্যাদি) জনসংখ্যায় অতিগণনা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অবগণনা হতে পারে। সামাজিক কারণে পুরুষদের চাইতে মহিলাদের বয়স প্রকাশে ভ্রান্তি অধিক হয়ে থাকে। সাধারণত: অবিবাহিতাগনের বয়স কম বলতে এবং সন্তান জন্মের পর বা সাংসারিক জীবনের শেষের দিকে বয়স বাড়ানোর প্রবণতা দেখা যায়। তবে জনমিতিবিদগণ এ ধরনের ভ্রান্তি নিরসণের একাধিক পরিসংখ্যানগত উপায় বের করেছেন যার দ্বারা জনসংখ্যার বয়:কাঠামোর মধ্যের অসঙ্গতি দূর করা সম্ভব। বয়:কাঠামো বিশ্লেষণে বেশ কিছু প্রচলিত সূচক এবং সূত্র রয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য এবং প্রচলিত কিছু পদ্ধতি পর্যালোচনা করা হলো।

বয়স গুচ্ছ বা বয়:শ্রেণী

বয়সগত বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যার সুবিধার জন্য জনসংখ্যাকে কতিপয় প্রধান বয়স শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। তুলনামূলক বিশ্লেষণের জন্য এ ধরনের বিভাজিত তথ্য সাধারণত: শতকরা হারে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এর দ্বারা প্রজনন বৈশিষ্ট্য এবং জনসংখ্যার কর্মক্ষমতা বা কর্মী জনসংখ্যার চরিত্রও প্রকাশ পায়। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে জনসংখ্যাকে সাধারণভাবে তিনটি বয়স শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ে থাকে

শিশু ও নবীন বয়স্ক - সাধারণত ০-১৪ অথবা ০-১৮ (যেমন উন্নত দেশে) বয়স্কদের এই শ্রেণীভুক্ত করা হয়ে থাকে। এই শ্রেণীভুক্ত জনসংখ্যা প্রধানত অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে অনুৎপাদনশীল, কেননা এরা প্রধানত স্কুলগামী বা শিক্ষার্থী এবং বয়স্কদের উপর অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে নির্ভরশীল।

প্রাপ্ত বয়স্ক- ১৫-৫৯ বা ১৫-৬৪ অথবা, যেমন উন্নতদেশে ১৯-৬০ বা ৬৪ বয়সসীমার জনসংখ্যাকে প্রাপ্ত বয়স্ক ধরা হয়ে থাকে। এই শ্রেণীর উচ্চ বয়স সীমা প্রধানত সামগ্রিক বয়:কাঠামোর উপর নির্ভর করে। যে সমস্ত দেশে উচ্চ মরণশীলতা দেখা যায়, অর্থাৎ উচ্চ মৃত্যু হার বিরাজ করে সেখানে জনসংখ্যার বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে স্বাভাবিক মৃত্যু হারও বৃদ্ধি পায়। ফলে ৬০ বৎসর বয়সের উর্ধ্বে জনসংখ্যার পরিমাণও কমে যেতে থাকে। সেক্ষেত্রে প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রেণীর শেষ বয়স সীমা ৬০ বৎসর ধরা হয়ে থাকে। এই পরিস্থিতি প্রধানত বিকাশশীল দেশে দেখা যায়। এর বিপরীত চিত্র উন্নত দেশে বিরাজ করে বলে

এই বয়স সীমা ৬৫ বৎসর ধরা হয়। প্রাপ্ত বয়স্ক জনসংখ্যা একটি দেশের সবচাইতে প্রজননশীল এবং উৎপাদনশীল জনগোষ্ঠী। এই শ্রেণীর জনগোষ্ঠী অভিগমন প্রবণও বটে।

উন্নত দেশসমূহ এই বয়স শ্রেণীভুক্ত জনসংখ্যার হারের তেমন কোন পরিবর্তন সাম্প্রতিককালে লক্ষ্য করা যায় না। কেননা, বৃদ্ধ বয়স্ক জনসংখ্যা নিম্নগামী শিশু জনসংখ্যা দ্বারা পরিপূরণ হয়ে যায়। অপরদিকে, শিশু বা অপ্রাপ্ত বয়স্কদের উচ্চ হারের কারণে বিকাশশীল দেশে প্রাপ্ত বয়স্ক জনসংখ্যার হার অপেক্ষাকৃত কম দেখা যায়।

বৃদ্ধ বা প্রবীন বয়স্ক - ৬০ বা ৬৫ বৎসর ও তদুর্ধ্ব বয়স্ক জনসংখ্যা বৃদ্ধ বা প্রবীন বয়স্ক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই বয়স শ্রেণীতে সকল জনগোষ্ঠীতে মহিলার আধিক্য দেখা যায়। এর প্রধান কারণ হচ্ছে, মহিলাদের সন্তান ধারন বয়স অতিক্রান্ত হলে মাতৃ মৃত্যু হার যথেষ্ট হ্রাস পায়, ফলে সাধারণত ৪৫ বৎসরের পর এদের আয়ুষ্কাল পুরুষ অপেক্ষা বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে এই শ্রেণীর পুরুষদের জীবনব্যাপী অর্থনৈতিক কর্মকান্ড জড়িত থাকার ফলে মানসিক ও শারীরিক চাপ এবং স্বাভাবিক বার্ধক্যজনিত রোগ-শোকের কারণে মৃত্যু হার বৃদ্ধি পায়। এ কারণে এই বয়স শ্রেণীতে উচ্চ বিধবা জনসংখ্যা হারও কোন কোন জনগোষ্ঠীতে দেখা যায়।

জনসংখ্যা এই তিন বয়:শ্রেণীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া এবং বিন্যাসের ভৌগোলিক বিভিন্নতা নানান কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত: এই বিভিন্নতা ব্যাখ্যায় তৃতীয় শ্রেণীটি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দ্বিতীয়টির উপর নির্ভরশীল। এ করণে শ্রেণীত্রয়ের আপেক্ষিক গুরুত্বের ক্ষেত্রে পরিমাপক ব্যবহারে বিশেষ যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। বস্তুত: প্রাপ্ত বয়স্ক জনসংখ্যা হারের মধ্যে ভৌগোলিক বিভিন্নতা তেমন ব্যাপক নয় এবং এই হারের প্রজননশীলতা ও মরণশীলতার সাথে নেতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে।

সারণী-৩.৯.১: জনসংখ্যার বয়:কাঠামোর বিশ্ব বিন্যাস, ২০০৮

অঞ্চল	শতকরা জনসংখ্যা			অঞ্চল	শতকরা জনসংখ্যা		
	শিশু/ নবীন	বয়স্ক	বৃদ্ধ/ প্রবীন		শিশু/নবীন	বয়স্ক	বৃদ্ধ/প্রবীন
বিশ্ব :	৩২	৬২	৬	**এশিয়া :**	৩৩	৬২	৫
উন্নত বিশ্ব	১৫	৬০	২৩	পশ্চিম এশিয়া	৩৯	৫৭	৪
বিকাশশীল বিশ্ব	৩৫	৫৫	১০	দক্ষিণ এশিয়া	৩৮	৫৮	৪
আফ্রিকা :	৪৫	৫২	৩	দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া	৩৭	৫৯	৪
উত্তর আফ্রিকা	৪১	৫৬	৩	পূর্ব এশিয়া	২৬	৬৭	৭
পশ্চিম আফ্রিকা	৪৬	৫১	৩	**ইউরোপ :**	২০	৬৭	১৩
পূর্ব আফ্রিকা	৪৭	৫০	৩	উত্তর ইউরোপ	২০	৬৫	১৫

মধ্য আফ্রিকা	৪৬	৫১	৩	পশ্চিম ইউরোপ	১৮	৬৭	১৫
দক্ষিণ আফ্রিকা	৩৮	৫৮	৪	পূর্ব ইউরোপ	২২	৬৬	১২
উত্তর আমেরিকা :	১২	৬০	২৮	দক্ষিণ ইউরোপ	১৮	৬৮	১৪
ল্যাটিন আমেরিকা :	৩৪	৬১	৫	**ওশানিয়া :**	২৬	৬৪	১০
মধ্য আমেরিকা	৩৭	৫৯	৪	অস্ট্রেলিয়া	২২	৬৬	১২
ক্যারিবীয় আমেরিকা	৩১	৬২	৭	নিউজল্যান্ড	২৩	৬৫	১২
দক্ষিণ আমেরিকা	৩৩	৬২	৫	**বাংলাদেশ**	৪২	৫৫	৩

[শিশু/নবীন ১৫ বৎসর বয়স; প্রাপ্ত বয়স্ক, ১৫-৬৪ বৎসর বৃদ্ধ/প্রবীন ৬৫ বৎসরের উর্দ্ধে]

উৎস : Population Reference Bureau, 2008, World Population Data Sheet, 2008. Washington DC.

তবে এই সম্পর্ক ব্যাপক অভিগমন হার দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। বিশ্বে উল্লেখযোগ্য ভৌগোলিক বিভিন্নতা শিশু ও নবীন বয়স্ক এবং বৃদ্ধ বা প্রবীন জনসংখ্যা হারের বিন্যাসের মধ্যে দেখা যায়। আবার দুই শ্রেণীর হারের মধ্যে নেতিবাচক সম্পর্ক বিরাজ করে থাকে।

নিম্ন শিশু জনসংখ্যার হার পশ্চিম ইউরোপের অতি নিম্ন জন্ম হারের কারণে দেখা যায়। এর বিপরীত ধারা আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় দেখা যায়। এ সমস্ত অঞ্চলে মোট জনসংখ্যার ৪৫ থেকে ৫০ শতাংশ শিশু ও নবীন জনসংখ্যা অন্তর্ভুক্ত। আবার এ সমস্ত অঞ্চলে উচ্চ মৃত্যুহারের কারণে বৃদ্ধ ও প্রবীন জনসংখ্যা হার অতি নিম্ন ৫ শতাংশেরও কম। বস্তুত: বিশ্বের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যা প্রাপ্ত বয়স্ক জনসংখ্যা শ্রেণীর উপর নির্ভরশীল। অতি উচ্চবৃদ্ধি হারের জনসংখ্যা সম্পন্ন দশসমূহ ইউরোপ মহাদেশে দেখা যায়। চিত্র ৩.৯.১-এ বিশ্বের নির্বাচিত বয়:কাঠামোর এরূপ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

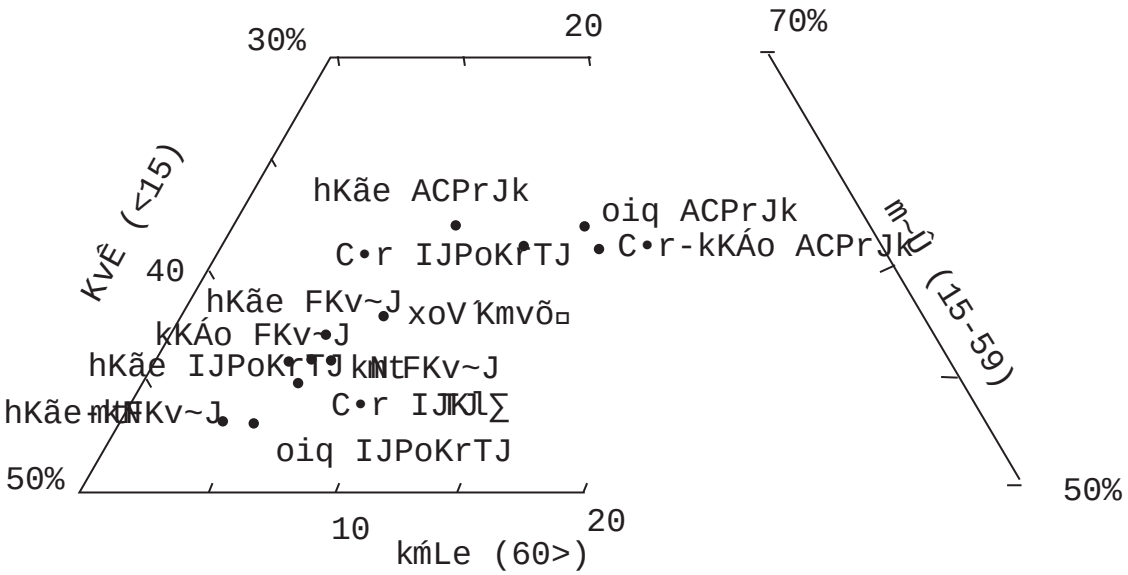

চিত্র ৩.৯.২: ত্রিকোন লেখ চিত্রে বিশ্বের কতিপয় নির্বাচিত দেশের বয়:কাঠামোর অবস্থান (১৯৫৪-৫৫) (Clarke, 1980)

সাম্প্রতিককালে জনসংখ্যার বয়স ভিত্তিক অনুপাতের গতিধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, পৃথিবীর উন্নত অঞ্চলে শিশু ও বৃদ্ধদের অনুপাত কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। উন্নত অঞ্চলে জন্ম হার হ্রাস ও আয়ুষ্কাল বৃদ্ধির ফলেই এরূপ ঘটেছে (সারণী-৩.৯.২)।

সারণী-৩.৯.১ জনসংখ্যার বয়:কাঠামোর বিশ্ব আঞ্চলিক বন্টনের শতকরা পরিবর্তন, ১৯৮৪-২০০৫।

	১৯৮৪			১৯৯৫			২০০৫		
অঞ্চল	শিশু/নবীন	বয়স্ক	বৃদ্ধ/প্রবীন	শিশু/নবীন	বয়স্ক	বৃদ্ধ/প্রবীন	শিশু/নবীন	বয়স্ক	বৃদ্ধ/প্রবীন
বিশ্ব	৩৪	৬০	৬	৩২	৬২	৬	২৮	৬৪	৮
উন্নত বিশ্ব	২২	৬৭	১১	২০	৬৭	১৩	২০	৭০	১০
বিকাশশীল বিশ্ব	৩৮	৫৮	৪	৩৫	৬০	৫	৩৮	৫৫	৭
দক্ষিণ এশিয়া	৩৯	৫৮	৩	৩৮	৫৮	৪	৪০	৫৫	৫
বাংলাদেশ	৪৬	৫১	৩	৪২	৫৫	৩	৪৫	৫২	২

উৎস: Population Reference Bureae, 1995, World Population Data Sheet, 2005. Washington DC এবং তাহা, আ. ১৯৯৮। "জনসংখ্যা ও জনপদ ভূগোল।" রাজশাহী: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

বিগত প্রায় চার দশকে বিশ্বের বিকাশশীল অঞ্চলে বিভিন্ন বয়স শ্রেণীতে জনসংখ্যার আনুপাতিক হারের বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। ফলে উন্নত অঞ্চলের সাথে এই অঞ্চলের জনসংখ্যার বয়:কাঠামো জনমিতিক বৈশিষ্ট্যের ব্যবধান বৃদ্ধি পেয়েছে।

বয়:সূচক

ইতিপূর্বে আলোচিত তিনটি প্রধান বয়:শ্রেণীর সম্পর্ক এবং ধরন নিম্নে বর্ণিত সূচক দ্বারা প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এই সমস্ত সূচক আন্ত-দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বয়:কাঠামোর তুলনামূলক ব্যাখ্যায় বিশেষ সহায়ক।

(ক) নবীনতা সূচক :

(১) $\frac{\text{শিশু জনসংখ্যা}}{\text{প্রাপ্ত বয়স্ক জনসংখ্যা}}$ (২) $\frac{\text{বৃদ্ধ জনসংখ্যা}}{\text{প্রাপ্ত বয়স্ক জনসংখ্যা}}$

(৩) $\frac{\text{শিশু জনসংখ্যা}}{\text{প্রাপ্ত বয়স্ক} + \text{বৃদ্ধ জনসংখ্যা}}$

(খ) প্রবীনতা সূচক :

(১) $\frac{\text{বৃদ্ধ জনসংখ্যা}}{\text{শিশু প্রাপ্ত বয়স্ক জনসংখ্যা}}$; (২) $\frac{\text{বৃদ্ধ জনসংখ্যা}}{\text{প্রাপ্ত বয়স্ক জনসংখ্যা}}$; (৩) $\frac{\text{বৃদ্ধ জনসংখ্যা}}{\text{শিশু জনসংখ্যা}}$

গ) মোট নির্ভরশীলতা সূচক : $\frac{\text{শিশু} + \text{বৃদ্ধ জনসংখ্যা}}{\text{প্রাপ্ত বয়স্ক জনসংখ্যা}}$

অনেক সময় এ সমস্ত সমীকরণকে ১০০ দ্বারা গুণন করে প্রমিতিকরণ করা হয়ে থাকে। এ সমস্ত সূচকের মধ্যে খ-(৩) এবং গ জনসংখ্যার বয়:কাঠামো বিশ্লেষণে বহুল প্রচলিত সূচক।

প্রবীনতা সূচক দ্বারা একটি জনসংখ্যার জনমিতিক ধারার পরিপক্কতা বা জরাগ্রস্ততা সম্পর্কে মন্তব্য করা যায়। একটি জনসংখ্যায় বৃদ্ধ জনসংখ্যার আনুপাতিক হার বেশী হলে প্রবীনতা হারও উচ্চ হবে। এই হার সরাসরি নির্ভরশীলতা হারকে প্রভাবিত করে থাকে। অপরদিকে বিভিন্ন জনসংখ্যার বয়:কাঠামোর তুলনামূলক বিশ্লেষণে সাধারণত: নির্ভরশীলতা সূচক ব্যবহার হয়ে থাকে। এই সূচক ব্যবহারের প্রধান সুবিধা হচ্ছে যে, এর দ্বারা বিভিন্ন দেশের বা জনসংখ্যার সক্ষম বা প্রাপ্ত বয়স্ক জনসংখ্যার উপর শিশু ও বৃদ্ধ নির্ভরশীল জনসংখ্যার চাপের মাত্রা অনুমান করা যায়। জাতিসংঘের সূত্র অনুসারে ২০১০ সালে বিশ্বে গড় নির্ভরশীলতার হার ছিল ০.৫৪ (অথবা প্রতি ১০০ জনে ৫৪ জন)। উন্নত অঞ্চলে এই হার ০.৪৯। বাংলাদেশে এই হার প্রায় ০.৫৩ (সারণি ৩.৯.৩)

সারণি ৩.৯ মোট নির্ভরশীলতা হারের আঞ্চলিক ধারার পরিবর্তন, ১৯৫০-২০১০

অঞ্চল	১৯৫০	১৯৮০	১৯৮৪	১৯৯৫	২০১০
বিশ্ব	০.৬৮	০.৭১	০.৬৭	০.৬১	০.৫৪
উন্নত বিশ্ব	০.৫৫	০.৫৩	০.৪৯	০.৪৯	০.৪৯
বিকাশশীল বিশ্ব	০.৭৫	০.৭৮	০.৭২	০.৬৬	০.৪২
দক্ষিণ এশিয়া	০.৮৩	০.৭৯	০.৭২	০.৭২	০.৫৬
বাংলাদেশ	০.৯৯	০.৮৬	০.৯৬	০.৮২	০.৫৩

উৎস: সারণী ৩.৯.১ অনুরূপ।

একটি দেশের অর্থনৈতিক পর্যায়ে এবং সম্পদ প্রাপ্তির অবস্থার আলোক জনসংখ্যার মোট নির্ভরশীলতা হার (এবং অনেক সময় বয়:কাঠামোর মধ্যমা মানসহ) 'জনাধিক্য' (Over-Population) সূচক হিসাবে ধরা যেতে পারে। ক্যামেরশেন (১৯৬৫)-এর মত অনুযায়ী মোট নির্ভরশীলতা হার ১.০০-এর উপরে হলে একটি দেশকে কার্যত: জনাধিক্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বলা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে জনসংখ্যার মাধ্যম বয়স নিম্ন হয়ে থাকে এবং এরূপ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দেশে ধীর গতিতে আর্থ-সামাজিক বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। সূচকটি অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণে জনাধিক্যতা পরিমাপের একটি সুচারু নির্ণয়ক না হলেও এটি একটি জনসংখ্যার বয়:কাঠামো ও শ্রম শক্তির ভারসাম্যহীনতার মাত্রা ও আকার নির্দেশ করে, যা বস্তুত: অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, সম্পদ ব্যবহারের উপর জনসংখ্যার চাপ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণের ব্যর্থতার সাথে জড়িত। বাংলাদেশসহ প্রায় বিকাশশীল দেশে মোট নির্ভরশীলতার হার ০.৬৫-এর উপরে। এ সমস্ত দেশে নানাভাবে জনসংখ্যার চাপ অনুভূত হচ্ছে, যা নিম্ন মাথাপিছু মোট জাতীয় সম্পদ প্রাপ্তিতে প্রকাশিত হচ্ছে। ফলে, বিকাশশীল দেশসমূহে নিম্ন বা অতি ধীর আর্থ-সামাজিক প্রবৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে। সাম্প্রতিককালে মোট নির্ভরশীলতা হারের গতিধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বিশ্বের উন্নত অঞ্চলে নির্ভরশীল জনসংখ্যার পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। অপরদিকে, বিকাশশীল অঞ্চলে এই হারের পরিবর্তন তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। ফলে এই দুই অঞ্চলের মধ্যে নির্ভরশীলতা হারের ব্যবধান লক্ষ্য করা যায়।

পাঠসংক্ষেপ:

জনসংখ্যা কাঠামো বলতে কোন দেশের জনসংখ্যা বা কোন জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসমূহকে বুঝায়। বস্তুত: এ সমস্ত বৈশিষ্ট্য জনসংখ্যার গাঠনিক চরিত্রমাত্র। স্বাভাবিকভাবে একটি জনসংখ্যার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মানুষ থাকে, যেমন, নারী, পুরুষ, বিবাহিত, অবিবাহিত, বিভিন্ন বয়:শ্রেণী সম্পন্ন, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, বিভিন্ন পেশা ইত্যাদি। জনসংখ্যার কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য দুই ধরনের হতে পারে-

(ক) জৈব বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কাঠামো (খ) অজৈব বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কাঠামো

এপাঠে বয়::কাঠামোর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ৩.৯

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন:

১. শূন্যস্থান পূরণ করুন:

১.১. -------- বয়স্ক জনসংখ্যা একটি দেশের সবচাইতে প্রজননশীল এবং উৎপাদনশীল জনগোষ্ঠী।

১.২. বৃদ্ধ বা প্রবীন বয়স শ্রেণীতে সকল জনগোষ্ঠীতে -------- আধিক্য দেখা যায়।

১.৩. ভৌগোলিক বিভিন্নতা শিশু ও নবীন বয়স্ক এবং বৃদ্ধ বা প্রবীন জনসংখ্যা হারের বিন্যাসের মধ্যে দেখা যায়। আবার দুই শ্রেণীর হারের মধ্যে -------- সম্পর্ক বিরাজ করে থাকে।

১.৪. সাম্প্রতিককালে জনসংখ্যার বয়স ভিত্তিক অনুপাতের গতিধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, পৃথিবীর উন্নত অঞ্চলে শিশু ও বৃদ্ধদের অনুপাত কিছুটা -------- পেয়েছে।

১.৫. -------- সূচক দ্বারা একটি জনসংখ্যার জনমিতিক ধারার পরিপক্কতা বা জরাগ্রস্ততা সম্পর্কে মন্তব্য করা যায়।

২. সত্য হলে 'স' মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন:

২.১. জনসংখ্যা কাঠামো বলতে কোন দেশের জনসংখ্যা বা কোন জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসমূহকে বুঝায়।

২.২. জনসংখ্যার যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য মানুষ জন্মের পর সাংস্কৃতিকভাবে গ্রহণ বা অর্জন করে তাকে অজৈব বা অর্জিত (Non-biological or Ascribed) বৈশিষ্ট্য/কাঠামো বলে।

২.৩. একটি দেশের বা জনগোষ্ঠীর বয়:কাঠামো সরাসরি দুইটি জনমিতিক উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয়।

২.৪. সামাজিক কারণে পুরুষদের চাইতে মহিলাদের বয়স প্রকাশে ভ্রান্তি অধিক হয়ে থাকে।

২.৫. দৃষ্টিভঙ্গিতে জনসংখ্যাকে সাধারণভাবে দুইটি বয়স শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ে থাকে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১. জনমিতিক পরিবৃদ্ধিকাল তত্ত্ব বা ধারা কাকে বলা হয়?

২. জনমিতিক পরিবৃদ্ধিকাল তত্ত্ব পর্যায় সমূহের বৈশিষ্ট্য কি কি?

রচনামূলক প্রশ্ন:

১. জনসংখ্যার কাঠামো বলতে কি বুঝ? অনার্জিত ও অর্জিত জনসংখ্যা কাঠামোর পার্থক্যকরণ করুন।

২. বয়:কাঠামো কাকে বলে? বয়:কাঠামোর প্রধান উপাদানসমূহ আলোচনা করুন।

৩. বয়:কাঠামোকে কেন বয়:শ্রেণীতে ব্যাখ্যা করা হয়। বয়:কাঠামোর প্রধান শ্রেণীগুলি আলোচনা করুন।

৪. বয়:কাঠামো ব্যাখ্যায় বয়:সূচক সমূহ উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ-৩.১০ জনসংখ্যা কাঠামো: বয়:পিরামিড

এই পাঠ শেষে আপনি-

- জনসংখ্যা কাঠামোর অন্তর্গত বয়:পিরামিড;
- বয়:পিরামিডের প্রকারভেদ;
- বিশ্ব লিঙ্গ অনুপাত ধারা; এবং
- লিঙ্গ অনুপাতের বৈষম্যের কারণ সম্পর্কে ধারনা লাভ করবেন।

বয়:শ্রেণী এবং বয়:সূচকসমূহ একটি জনসংখ্যার বয়:কাঠামোর সরলীকৃত ধারণামাত্র। কেননা এতে কেবল নির্দিষ্ট বয়স ব্যবধানে জনসংখ্যাকে শ্রেণীভুক্ত করা হয়ে থাকে। বয়:কাঠামো সম্পর্কে বিস্তৃত ধারণা লাভ করা যায় জনসংখ্যার বয়:পিরামিড বিশ্লেষণের মাধ্যমে। বয়:পিরামিডের একটি বিশেষ সুবিধা হলো যে, এতে বয়সভেদে নারী ও পুরুষ জনসংখ্যার আনুপাতিক বা সংখ্যাগত বিন্যাস প্রতিফলিত। একটি আদর্শ বয়:পিরামিডের মাধ্যস্থ উলম্ব বাহুতে নিচ থেকে শীর্ষে o থেকে ১,৫ বা ১০ বৎসর বিরতিতে বয়স এবং আনুভূমিক বাহুতে ডান দিকে পুরুষ ও বাম দিকে নারী জনসংখ্যা প্রকৃত সংখ্যায় অথবা শতকরা হারে দেখানো হয় (চিত্র ৩.১০.১)।

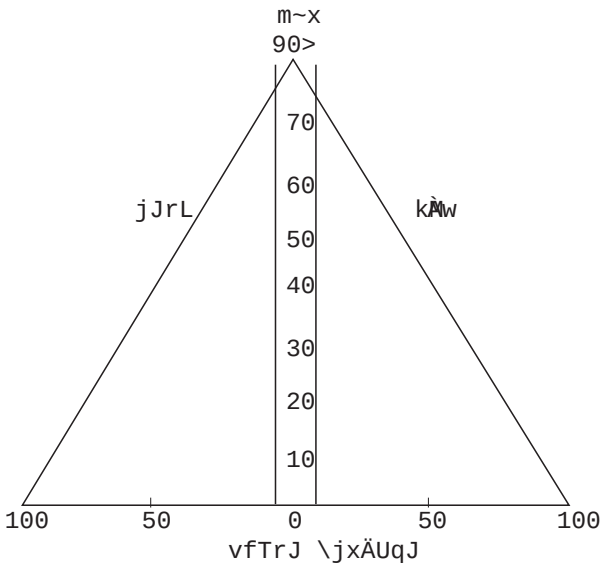

চিত্র ৩.১০.১: একটি আদর্শ বয়:পিরামিড

বিভিন্ন জনগোষ্ঠি বা দেশের মধ্যে তুলনার জন্য জনসংখ্যার নারী পুরুষভেদে শতকরা হার ব্যবহার শ্রেয়। ব্যবহৃত বয়স বিরতি বা শ্রেণী যত কম হবে (যেমন, ১ বৎসর) বয় পিরামিডটি তত বেশী বাস্তবানুগ ও বিশ্লেষণমূলক হবে। তবে তথ্যের গুণগত মান এর প্রধান পূর্ব শর্ত। বিশ্বের বেশির ভাগ দেশে এই মান সম্পর্কে কিছু সন্দিহান থাকার কারণে ৫ বা ১০ বৎসর শ্রেণী বিভাজিত বয়স তথ্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

বয়:পিরামিড কদাচিৎ সুষম হয়ে থাকে। এর প্রধান কারণ মৃত্যু হারে লিঙ্গগত পার্থক্য এবং অনেকক্ষেত্রে অভিগমন হারের প্রভাব। একারণে বিভিন্ন ধরনের বয়:পিরামিড বিভিন্ন দেশে বা জনগোষ্ঠীতে দেখা যায়।

বয়:পিরামিডের প্রকারভেদ : বয়:পিরামিড জনসংখ্যার লিঙ্গ ভিত্তিক বয়সগ্রন্থার গঠনগত বা কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যের অন্যতম নির্দেশক। এক্ষেত্রে নারী-পুরষ বয়সভেদ সংখ্যাগত বা আনুপাতিক বিন্যাসের উপর 'পিরামিড' চিত্রটির আকার নির্ভর করে। পূর্বেই যেমন উল্লেখ করা হয়েছে - বয়:শ্রেণীতে নারী-পুরুষ হারের তারতম্যের বিশেষ পরিবর্তন ঘটলে, তথা জন্ম, মৃত্যু ও অভিগমন হারের বিশেষ পরিবর্তন হলে জনসংখ্যার বয়:পিরামিডের আকৃতিগত পরিবর্তন ঘটবে। যুদ্ধ বিগ্রহ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বার্ধক্যের অভিগমন বা উদ্ধাস্তু প্রভৃতির প্রভাব ছাড়াও জনসংখ্যার স্বাভাবিক পরিবৃত্ত (Tansition) প্রক্রিয়ায়

বয়:পিরামিডের আকৃতিগত পরিবর্তন ঘটে। এ সমস্তের ভিত্তিতে জনসংখ্যা পিরামিডকে ছয়টি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলি নিচে সংক্ষেপ আলোচনা করা হলো :

সম্প্রসারণশীল (Expansive বা Progressive) : এ ক্ষেত্রে বয়:পিরামিডের ভূমি অত্যন্ত প্রশস্ত এবং শীর্ষভাগ সংকীর্ণ হয়ে থাকে। মোট জনসংখ্যায় শিশু ও নবীনদের হার প্রায় ৫০ শতাংশ, বৃদ্ধদের হার ৫ শতাংশ বা কম হতে পারে। এই অবস্থায় জনসংখ্যায় মোট নির্ভরশীলতা হার অতি উচ্চ এবং মাধ্যমা বয়স (Median age) কম হয় (২০ বৎসরের নিচে)। উচ্চ জন্ম হার এবং নিম্ন আয়ুষ্কাল জনসংখ্যার প্রধান বৈশিষ্ট্য (চিত্র ৩.১০.২)। বিকাশশীল দেশসমূহের এবং বাংলাদেশের বয়:পিরামিড এরূপ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

স্থিতিশীল (Stationary): স্থিতিশীল বয়:পিরামিডের ভূমি বা পাদদেশ অপ্রশস্ত এবং শীর্ষভাগ কিছুটা গম্বুজাকার হয়ে থাকে (চিত্র ৩.১০.২)। মোট জনসংখ্যার শিশু ও নবীন প্রায় ২৫ শতাংশ, বৃদ্ধ ১০ থেকে ১৫ শতাংশ হয়ে থাকে, ফলে মোট নির্ভরশীলতা হার সবচেয়ে কম এবং মধ্যমা বয়স উচ্চ হয়। নিম্ন জন্ম হার, উচ্চ গড় আয়ুষ্কাল এবং নিম্ন অভিগমন হারের জন্য এরূপ বয়:পিরামিড সৃষ্টি হয়। অধিকাংশ উন্নত দেশের বয়:পিরামিড এরূপ।

বয়:পিরামিডের আদর্শ আকার মিসরীয় পিরামিডের (Pyramind) যত দেখায় বলে এরূপ নাম করণ করা হয়েছে।

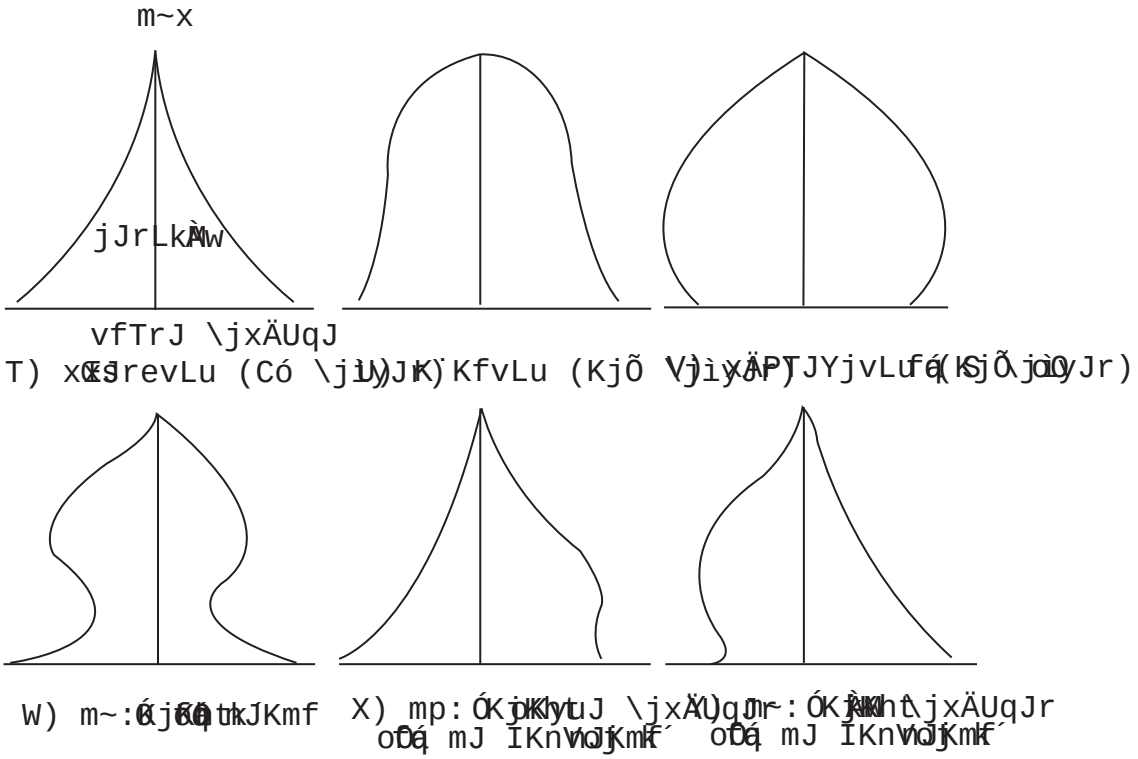

চিত্র ৩.১০.২: বয়:পিরামিডের প্রধান ধরণ

সংকোচনশীল (Constructive or Regressive): এরূপ বয়:পিরামিডের ভূমি অত্যন্ত অপ্রশস্ত এবং মধ্যভাগ স্ফীত ও শীর্ষভাগ সামান্য চাপা থাকে (চিত্র ৩.১০.২)। মোট জনসংখ্যায় শিশু ও নবীনদের হার

খুব কম (২০ শতাংশের নিচে), বয়স্কদের অনুপাত উচ্চ হয়ে থাকে। এরূপ পিরামিডযুক্ত জনসংখ্যায় জন্ম হার ও মৃত্যু হার খুবই কম থাকে ফলে কর্মক্ষম বয়:শ্রেণীতে জনসংখ্যার আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। নিম্ন জন্ম ও মৃত্যু হারের কারণে জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধি হার ও নিম্ন পর্যায়ে থাকে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি অতি ধীরে বা ঋন্ত্মক হয়ে থাকে। ইউরোপের কতিপয় দেশ, যেমন, অস্ট্রিয়া, সুইডেন এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সিঙ্গাপুরে এরূপ বয়:পিরামিড দেখা যায়।

বয়:নির্দিষ্ট মৃত্যু প্রভাবিত: নির্দিষ্ট বয়:শ্রেণীতে উচ্চ মৃত্যু হারের কারণে এরূপ বয়:পিরামিড সৃষ্টি হয়। সাধারণত দুর্ভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি প্রাকৃতিক ও মানব সৃষ্ট কারণে আক্রান্ত দেশ বা জনসংখ্যায় এরূপ বয়:পিরামিড দেখা যায়। এক্ষেত্রে উচ্চ মৃত্যু হার নারী-পুরুষ উভয়কে আক্রান্ত করে। নিম্ন ও উচ্চ বয়স সীমার জনসংখ্যায় উচ্চ মরণশীলতার কারণে পিরামিডটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আকার ধারণ করে (চিত্র ৩.১০.২)। মধ্য আফ্রিকার বেশ কিছু দেশে এরূপ বয়:পিরামিড লক্ষ্যণীয়।

(ঙ) মহিলা জনসংখ্যায় বয়:নির্দিষ্ট মৃত্যু বা অভিগমন প্রভাবিত: এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বয়স শ্রেণীতে (যেমন, প্রজননশীল বয়স সীমায়) উচ্চ মৃত্যু হার (যেমন, বিকাশশীল দেশে পুরুষদের অভিগমন (যেমন, অনেক উন্নতদেশের শহরাঞ্চলে) এরূপ বয়:পিরামিডের সৃষ্টি হয় (চিত্র ৩.১০.২)।

(চ) পুরুষ জনসংখ্যায় বয়:নির্দিষ্ট মৃত্যু বা অভিগমন প্রভাবিত: এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী (ঙ) বয়:পিরামিডের বিপরীত পরিস্থিতি বিরাজ করে। বেশ কিছু শহরাঞ্চল এবং গ্রাম থেকে পুরুষ জনসংখ্যার বহিগর্মন এরূপ পিরামিডের সৃষ্টি করে(চিত্র ৩.১০.২)।

লিঙ্গ কাঠামো

জনসংখ্যার মধ্যে নারী ও পুরুষের ব্যাপক সংখ্যাগত পার্থক্য না থাকলেও সমাজ ও অর্থনীতিতে এই দুই শ্রেণীর ভূমিকার ভিন্নতা থাকার কারণে লিঙ্গ কাঠামো (Sex Structure) কাঠামো ভূগোলবিদদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ। যে কোন আদমশুমারীতে লিঙ্গ ভেদে জনসংখ্যা সঠিকভাবে পাওয়া যায় কিন্তু অন্যান্য বৈশিষ্ট্য, বিশেষ করে লিঙ্গ ভেদে বয়:কাঠামোতে তথ্য ভ্রান্তিপূর্ণ হতে পারে। একটি জনসংখ্যায় লিঙ্গ কাঠামো 'লিঙ্গ অনুপাত' (Sex Ratio) দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এই অনুপাত তিনভাবে প্রকাশ করা যায় :

ক) প্রতি হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যা (অথবা প্রতি হাজার নারীতে পুরুষের সংখ্যা);

খ) মোট জনসংখ্যায় নারী বা পুরুষের শতকরা হার; এবং

গ) নারী ও পুরুষের (অথবা পুরুষ ও নারীর) গাণিতিক অনুপাত।

জনমিতিক বিশ্লেষণে সাধারণত: (ক) বর্ণিত লিঙ্গ অনুপাত ব্যবহার করা হয়। নিম্নে এর সূত্র দেওয়া হলো:

$$\text{লিঙ্গ অনুপাত} = \frac{t}{m} \propto ১০০০$$

যখন, t = মোট নারীর সংখ্যা; m = মোট পুরুষের সংখ্যা; এবং ১০০০ ধ্রুবক।

বিশ্ব লিঙ্গ অনুপাত ধারা

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লিঙ্গ অনুপাত পর্যালোচনা করলে উন্নত ও বিকাশীল অঞ্চলে নারী ও পুরুষের সংখ্যাগত বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায় কতিপয় ব্যতিক্রম ছাড়া উন্নত দেশগুলিতে নারীর এবং বিকাশশীল দেশগুলিতে পুরুষের সামান্য সংখ্যাধিক্য রয়েছে। পশ্চিম ইউরোপে প্রতি ১০০০ জন নারীর তুলনায় পুরুষ সংখ্যা গড়ে প্রায় ৯৪০ জন। বাংলাদেশ ২০১০ সালে প্রতি ১০০০ জন নারীর তুলনায় পুরুষের সংখ্যা ১০৫৯ জন, ভারতে এই সংখ্যা ছিল ১০৭৮ জন। উন্নত ও বিকাশশীল অঞ্চলে লিঙ্গভেদে মৃত্যু হারের তারতম্যই নারী পুরুষ সংখ্যার পার্থক্যের কারণ। সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন তুলনামূলক-ভাবে নারীরা মৃত্যু হার অপেক্ষাকৃত অধিক হ্রাস করে, ফলে উন্নত দেশ গুলিতে নারীর সামান্য সংখ্যা গরিষ্ঠ হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে পুষ্টি ও চিকিৎসার বিশেষ করে, প্রসূতি পরিচর্যার অভাব ও প্রসবজনিত মৃত্যুর কারণে বিকাশশীল অঞ্চলে নারীদের মধ্যে মৃত্যু হার অপেক্ষাকৃত বেশী; ফলে বিকাশশীল দেশসমূহে নারীরা সংখ্যালঘু। তবে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে নারীদের পক্ষে অবস্থার উন্নয়ন ঘটে অধিকতর প্রতিরোধ ক্ষমতা নারীদের সহজাত বৈশিষ্ট্য। ল্যাটিন আমেরিকার কতিপয় দেশে, বিশেষ করে মেক্সিকো এবং ব্রাজিলে নারী-পুরুষ সংখ্যার বিন্যাস এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। ২০১০ সালে মেক্সিকো ও ব্রাজিলে প্রতি ১০০০ জন নারীর তুলনায় পুরুষ সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৯৮০ ও ৯৩০ জন। মৃত্যুহারের তারতম্য ছাড়াও লিঙ্গভেদে অভিগমনের ফলেও কোন জনসংখ্যার নারী পুরুষ বিন্যাসের বিশেষ তারতম্য ঘটতে পারে।

কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ার মত উন্নত দেশে পুরুষরা সামান্য সংখ্যাগরিষ্ট; প্রতি ১০০০ জন নারীর তুলনায় পুরুষ সংখ্যা প্রায় ১০০১ জন। এর মূল কারণ কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ায় পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চল থেকে বাস্তুত্যাগী পুরুষদের অপেক্ষাকৃত ব্যাপক হারে আগমন। অভিগমনের ফলে পশ্চিমা বিশ্বে অনেক অঞ্চলে নারী-পুরুষ বিন্যাসের বিশেষ পরিবর্তন ঘটে। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ১০০০ জন নারীর তুলনায় পুরুষের সংখ্যা ছিল ১০৭০ জন। বর্তমানে এই অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। ২০১০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ১০০০ জন নারীর তুলনায় পুরুষের সংখ্যা ছিল প্রায় ৯৫১ জন। সাম্প্রতিক কালে মধ্যপ্রাচ্যের কতিপয় দেশে নারী-পুরুষ ভারসাম্যের বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এ প্রসঙ্গে কুয়েতের অবস্থা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৭ সালে কুয়েতে প্রতি ১০০০ জন নারীর তুলনায় পুরুষের সংখ্যা ছিল প্রায় ১৭৭০ জন; ১৯৬৫ সালে এই সংখ্যা ছিল ১৫৮০। বর্তমানে এই সংখ্যা প্রায় ১৫০০। প্রশান্ত মহাসাগরীয় কতিপয় দ্বীপাঞ্চল ছাড়া নারী-পুরুষ সংখ্যার এরূপ ভারসাম্যহীনতা আর লক্ষ্য করা যায় না। উচ্চ জন্ম হার, মোট জনসংখ্যার শিশু ও অপ্রাপ্ত বয়স্কদের উচ্চ অনুপাত, শুমারীতে নারীদের সঠিকভাবে গণনা না করা এবং পুরুষ শ্রমিক আগমন প্রভৃতি পুরুষের সংখ্যাধিক্যের কারণ বলে মনে করা হয়। উন্নত বিশ্বে পূর্ব জার্মানী এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে নারী-পুরুষ সংখ্যার বিশেষ ভারসাম্যহীনতা রয়েছে। ১৯৯১ সালে তৎকালীন সোভিয়েট ইউনিয়নে এবং পূর্ব জার্মানীতে প্রতি ১০০০ জন নারীর তুলনায় পুরুষের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৯০৫ ও ৮৫৫ জন। এই সংখ্যা ১৯৫০ দশকে আরো কম ছিল। বিভিন্ন যুদ্ধে বিশেষ করে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে পুরুষদের ব্যাপক মৃত্যুই জার্মানী ও সোভিয়েত ইউনিয়নে পুরুষ সংখ্যা স্বল্পতার মূল কারণ ১৫ থেকে ৪৯ ব:সর বয়স্ক পুরুষের হিসাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান ও সোভিয়েট বাহিনীর নিহত সৈনিকের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৬.৬% এবং ৯%। ফলে পরবর্তী কয়েক দশক এই সমস্ত দেশ সমূহে লিঙ্গ অনুপাত যথেষ্ট নিম্ন ছিল।

নগরায়ন ও লিঙ্গ অনুপাত

উন্নত ও বিকাশশীল অঞ্চলের শহর এলাকায় নারী ও পুরুষের সংখ্যাগত বৈপরীত্য পরিদৃষ্ট হয়। সাধারণভাবে উন্নত অঞ্চলের শহরগুলিতে নারীদের সংখ্যাধিক্য রয়েছে। অন্যদিকে বিকাশশীল অঞ্চলের শহর এলাকায় পুরুষরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। ২০১০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শহরাঞ্চলে প্রতি ১০০০ জন নারীর তুলনায় পুরুষের সংখ্যা ছিল ৯৩০ জন। বাংলাদেশে ২০১০ সালে শহর এলাকায় প্রতি ১০০০ জন নারীর তুলনায় পুরুষের সংখ্যা ছিল ১১৯০ জন। দ্রুত নগরায়নের ফলে বাংলাদেশে শহুরে পুরুষের সংখ্যা বৃদ্ধিমুখী। তবে পূর্ববর্তী দশকের তুলনায় এই হার বর্তমানে নিম্নমুখী। বিকাশশীল অঞ্চলে শহর সমূহে পুরুষের সংখ্যাধিক্যের প্রধান কারণ হচ্ছে গ্রামাঞ্চলে অর্থনৈতিক কর্মতৎপরতার অবনতি, পুরুষের ব্যাপকহারে শহরে অভিগমন, শহরে নারী কর্মসংস্থানের অভাব এবং গ্রামীন ও কৃষি কর্মকান্ডে নারীদের প্রচলিত সম্পৃক্ততা। বিকাশশীল অঞ্চলের মধ্যে ল্যাটিন আমেরিকার কতিপয় দেশে এই ধরার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। ল্যাটিন আমেরিকার সমাজ ও সংস্কৃতিতে কৃষি ও গ্রামীন কর্মকান্ডে নারীদের ভূমিকা বিশেষ সক্রিয় নয় এবং এই অঞ্চলের শহরগুলিতে নারী কর্মসংস্থানের অধিকতর সুযোগ সুবিধা রয়েছে।

বয়স ভিত্তিক নারী-পুরুষ কাঠামো

নারী-পুরুষের বয়স ভিত্তিক বিন্যাস জনমিতিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নারী ও পুরুষের বয়সের আনুপাতিক বিন্যাসের ভিত্তিতে কোন জনসংখ্যাকে যুবা বা বর্ধিষ্ণু এবং জরাগ্রস্থ (Aging) হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। কেননা বয়সের উপর নারী-পুরুষের প্রজননশীলতা নির্ভর করে। সাধারণভাবে কোন জনসংখ্যার ৩৫ শতাংশের বেশীর বয়স ১৫ বৎসরের কম হলে সেরূপ জনসংখ্যাকে বর্ধিষ্ণু বা যুবা এবং ৬৫ বৎসরের উর্ধ্বে ১৫% এর বেশী হলে জরাগ্রস্থ জনসংখ্যা হিসাবে অভিহিত করা হয়। স্বাভাবতই জরাগ্রস্থ জনসংখ্যায় বৃদ্ধদের সংখ্যা বেশী থাকে (১৫%-এর বেশী), অন্য দিকে যুবা জনসংখ্যায় শিশু ও নবীন বয়স্কদের সংখ্যা বেশী থাকে (৩৫%) -এর বেশী। এ ছাড়া জরাগ্রস্থ জনসংখ্যায় বয়সভেদে নারী পুরুষের অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার আনুপাতিক হারের ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না; পক্ষান্তরে যুবা জনসংখ্যার বিভিন্ন বয়স শ্রেণীতে জনসংখ্যার অনুপাতে বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায় চিত্র (৩.১০.৩)।

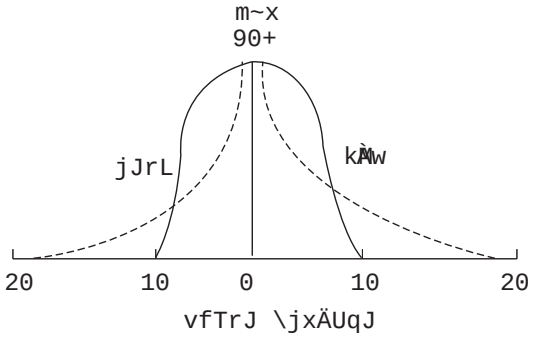

চিত্র -৩.১০.৩: বয়স ভেদে লিঙ্গ অনুপাতের পার্থক্য।

লিঙ্গ অনুপাতের বৈষম্যের কারণ

মানুষসহ প্রায় সকল স্তন্যপায়ী প্রাণীর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো যে, নারীর চাইতে পুরুষ সন্তান কিছুটা কম জন্ম গ্রহণ করে। গর্ভাবস্থায় পুরুষ ভ্রুণ সংখ্যা বেশী থাকলেও মৃত প্রসবে পুরুষ সন্তানের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। এতদ্বসত্ত্বেও জন্মকালীন লিঙ্গ অনুপাত প্রতি ১০০ জন নারী সন্তানে ১০৪ থেকে ১০৭ জন পুরুষ সন্তান জন্মগ্রহণ করে। বিষয়টি সম্ভবত পরবর্তীতে বিশেষ করে ০-১ বা ০-৫ বৎসরের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা মৃত্যুজনিত কারণে হ্রাস পায়। বিষয়টি উন্নত ও বিকাশশীল অঞ্চল উভয়ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু এর অন্তর্নিহিত কারণ সম্পর্কে জনমিতিবিদগণ এখনও নিশ্চিত নন। তবে এমন মনে করা হয় যে, কোন জনগোষ্ঠী বা দেশের জীবনযাত্রার মান এবং গর্ভাবস্থায় স্বাস্থ্যসেবার মানের সাথে বিষয়টির সম্পর্ক থাকতে পারে। যার ফলে বিকাশশীল দেশে জন্মলগ্নে এবং নবজাতক পুরুষ শিশুর মৃত্যু হার নারী শিশুর চাইতে বেশী। যুক্তরাষ্ট্রের অভিজাত বংশদ্ভুত অধিবাসীদের মধ্যেও এরূপ বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। অপরদিকে প্রায় সকল পিতৃতান্ত্রিক সমাজে সামাজিক বা সাংস্কৃতিক কারণে পুরুষ শিশুর প্রতি আকর্ষণ ও তাদের লালনপালনে পক্ষপাতিত্ব পরবর্তীতে পুরুষের পক্ষে লিঙ্গ অনুপাত বৃদ্ধি পায়। কৃষি নির্ভর বিকাশশীল দেশসমূহে এ ধরনের প্রবণতা অধিক লক্ষ্য করা যায়। কোন কোন পর্যায়ে এ ধরনের প্রবণতা মহিলা শিশু হত্যায় পর্যবশিত হয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এখনও এ ধরনের উদাহরণ দেখা যায়। সামগ্রিকভাবে প্রায় সকল জনগোষ্ঠী বা দেশে নারীর চাইতে পুরুষ মরণশীলতা উচ্চ হয়ে থাকে। এই অসমতা শিশুর জন্মলগ্নে অধিক লক্ষ্য করা যায়। তাই জন্মলগ্নে পুরুষ সন্তানের গড় আয়ুষ্কাল মহিলা শিশুর চাইতে কম হয়ে থাকে। সাধারণত এ ধরনের অসমতা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, আর্জেন্টিনা এবং ইউরোপীয় দেশসমূহে দেখা যায়। কিন্তু এর প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান সহজসাধ্য নয়। একই কারণে শিশুর জন্মলগ্নে লিঙ্গ অনুপাতের উচ্চ ধারা প্রতিষ্ঠা করাও কঠিন। তবে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীতে পুরুষ শিশু মৃত্যু হারের ধারা প্রায় প্রমাণিত। অনেক ক্ষেত্রে পরবর্তী বয়স শ্রেণীতে বিষয়টি প্রতিফলিত হতে থাকে। উন্নত বিশ্বে এই ধারা পরবর্তীতে প্রবীন বয়:শ্রেণীতে বৃদ্ধার উচ্চ হারের সঙ্গে প্রতিফলিত হয়। অপরদিকে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার অনেক বিকাশশীল দেশে অতি উচ্চ মাতৃ মৃত্যু হার পুরুষ মৃত্যু হারকে যথেষ্ট অতিক্রম করে, ফলে অনেক ক্ষেত্রে উচ্চ লিঙ্গ হার অর্থাৎ জনসংখ্যায় পুরুষ প্রাধান্য বিরাজ করে। লিঙ্গ বৈষম্যের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো লিঙ্গ নির্দিষ্ট অভিগমন। সাধারণত পুরুষগণ মহিলাদের চাইতে অধিক অভিগমনপ্রবণ। প্রধানত: পেশাগত কারণে বা সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক কারণে পুরুষ নির্দিষ্ট অভিগমন বিকাশশীল প্রায় সকল দেশের জন্য প্রযোজ্য। এ কারণে প্রাপ্তবয়স্ক বা কর্মরত পুরুষগণ অভিগমন করে উৎস স্থানে ১৫ বা ১৮ থেকে ৪০ বৎসরের মধ্যে। লিঙ্গ অনুপাত হ্রাস পেয়ে জনসংখ্যার ঐ বয়:শ্রেণীতে মহিলা প্রাধান্য দেখা যায়। তবে উন্নত দেশসমূহে মহিলাদের উচ্চ শিক্ষার হার, যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি ও গতি সঞ্চার মহিলা অভিগমন উৎসাহিত করেছে। এমনকি কোন কোন দেশে, যেমন– যুক্তরাজ্য, জার্মানী, নেদারল্যান্ড প্রভৃতি দেশে বয়:নির্দিষ্ট মহিলা অভিগমনের ফলে এ সমস্ত দেশের গ্রামাঞ্চলে নিম্ন লিঙ্গ অনুপাত অর্থাৎ পুরুষদের আধিক্য দেখা যায়। অভ্যন্তরীণ অভিগমনের ক্ষেত্রে এ ধরণের লিঙ্গ অনুপাতে পুরুষের আধিক্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। আবার কোন অঞ্চলের বা শহরের পেশাগত কাঠামো লিঙ্গ অনুপাতকে প্রভাবিত করে। সেনা নিবাস শহর, শিল্প শহর, বন্দর নগর, খনিজ কেন্দ্র ইত্যাদিতে পুরুষ আধিক্য লিঙ্গ কাঠামোর

বৈশিষ্ট্য। অপরদিকে, উন্নত দেশে বিনোদন কেন্দ্র বা শহর হালকা শিল্প কেন্দ্র, কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক শহর এবং ক্ষুদ্র বাণিজ্য শহরের লিঙ্গ কাঠামোয় নারীর আধিক্য লক্ষ্য করা যায়।

সারণী ৩.১০.১: বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরের লিঙ্গ কাঠামো ২০০৯

বৎসর	গ্রামীন			নগরীয়		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
২০০১	৫০.৬৩	৪৮.৯২	৯৯.৫৫	১৬.৪৪	১৪.০২	৩০.৩৭
২০০২	৫১.৫৩	৪৯.৮২	১০১.৩৫	১৬.৮৬	১৪.৩৯	৩১.২৫
২০০৩	৫২.৩	৫০.৬২	১০২.৯২	১৭.৩৭	১৪.৮৩	৩২.২
২০০৪	৫২.৯৩	৫১.২৮	১০৪.২১	১৭.৯৬	১৫.৩৬	৩৩.৩৩
২০০৫	৫৩.৩৬	৫১.৭৮	১০৫.১৪	১৮.৬৫	১৫.৯৭	৩৪.৬২
২০০৬	৫৩.৬	৫২.১০	১০৫.৬৯	১৯.৪৩	১৬.৬৭	৩৬.১১
২০০৭	৫৩.৮৪	৫২.৪১	১০৬.২৬	২০.২৫	১৭.৪০	৩৭.৬৫
২০০৮	৫৪.০৩	৫২.৬৮	১০৬.৭০	২১.০৮	১৮.১৪	৩৯.২২
২০০৯	৫৪.১৫	৫২.৮৯	১০৭.০৪	২১.৯২	১৮.৮৯	৪০.৮২
২০১০	৫৪.২২	৫৩.০৪	১০৭.২৬	২২.৭৭	১৯.৬৬	৪২.৪৩
২০১১	৫৪.২২	৫৩.১৩	১০৭.৩৫	২৩.৬৩	২০.৪৩	৪৪.০৬
২০১২	৫৪.২৩	৫৩.২২	১০৭.৪৫	২৪.৫২	২১.২৩	৪৫.৭৫
২০১৩	৫৪.২৩	৫৩.৩২	১০৭.৫৫	২৫.৪৪	২২.০৭	৪৭.৫১
২০১৪	৫৪.২৪	৫৩.৪১	১০৭.৬৫	২৬.৪০	২২.৯৩	৪৯.৩৩
২০১৫	৫৪.২৪	৫৩.৫	১০৭.৭৪	২৭.৩৯	২৩.৮৩	৫১.২২

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেট বই ২০০৯

পাঠসংক্ষেপ:

বয়:শ্রেণী এবং বয়:সূচকসমূহ একটি জনসংখ্যার বয়:কাঠামোর সরলীকৃত ধারণামাত্র। কেননা এতে কেবল নির্দিষ্ট বয়স ব্যবধানে জনসংখ্যাকে শ্রেণীভুক্ত করা হয়ে থাকে। বয়:কাঠামো সম্পর্কে বিস্তৃত ধারণা লাভ করা যায় জনসংখ্যার বয়:পিরামিড বিশ্লেষণের মাধ্যমে। বয়:পিরামিড বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। যেমন- সম্প্রসারণশীল, স্থিতিশীল, সংকোচনশীল, বয়:নির্দিষ্ট মৃত্যু প্রভাবিত, মহিলা জনসংখ্যায় বয়:নির্দিষ্ট মুত্যু বা অভিগমন প্রভাবিত এবং পুরুষ জনসংখ্যায় বয়:নির্দিষ্ট মৃত্যু বা অভিগমন প্রভাবিত প্রভৃতি। বিশ্ব লিঙ্গ অনুপাতের একটি নির্দিষ্ট ধারা আছে। প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে এই পাঠে আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ৩.১০

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. শূন্যস্থান পূরণ করুনঃ

১.১. বয়:শ্রেণী এবং বয়:সূচকসমূহ একটি জনসংখ্যার বয়:কাঠামোর -------- ধারণা মাত্র।

১.২. স্থিতিশীল বয়:পিরামিডের ভূমি বা পাদদেশ অপ্রশস্ত এবং শীর্ষভাগ কিছুটা ------- হয়ে থাকে।

১.৩. সংকোচনশীলএরূপ বয়:পিরামিডের ভূমি অত্যন্ত ------- এবং মধ্যভাগ স্ফীত ও শীর্ষভাগ সামান্য চাপা থাকে।

১.৪. বয়:নির্দিষ্ট মৃত্যু প্রভাবিত: নির্দিষ্ট বয়:শ্রেণীতে ------- হারের কারণে এরূপ বয়:পিরামিড সৃষ্টি হয়।

১.৫. মহিলা জনসংখ্যায় বয়:নির্দিষ্ট ------ বা অভিগমন প্রভাবিত।

১.৬. পুরুষ জনসংখ্যায় বয়:নির্দিষ্ট মৃত্যু বা ------ প্রভাবিত।

২. সত্য হলে 'স' মিথ্যা হলে 'মি' লিখুনঃ

২.১ পশ্চিম ইউরোপে প্রতি ১০০০ জন নারীর তুলনায় পুরুষ সংখ্যা গড়ে প্রায় ৯০০ জন।

২.২. উন্নত ও বিকাশশীল অঞ্চলে লিঙ্গভেদে মৃত্যু হারের তারতম্যই নারী পুরুষ সংখ্যার পার্থক্যের কারণ।

২.৩. উন্নত ও বিকাশশীল অঞ্চলের শহর এলাকায় নারী ও পুরুষের সংখ্যাগত বৈপরীত্য পরিদৃষ্ট হয়।

২.৪. মানুষসহ প্রায় সকল স্তন্যপায়ী প্রাণীর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো যে, পুরুষের চাইতে নারী সন্তান কিছুটা কম জন্ম গ্রহণ করে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১. জনমিতিক পরিবৃদ্ধিকাল তত্ত্ব বা ধারা কাকে বলা হয়?

২. জনমিতিক পরিবৃদ্ধিকাল তত্ত্ব পর্যায় সমূহের বৈশিষ্ট্য কি কি?

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. বয়:পিরামিড বলতে কি বুঝ? প্রধান বয়:পিরামিড সমূহের কাঠামোগত পর্যালোচনা কর।

২. লিঙ্গ কাঠামো বলতে কি বুঝ? জনসংখ্যার লিঙ্গ কাঠামো কি ভাবে নিরূপিত হয়? লিঙ্গ অনুপাতের প্রভাবকারী উপাদানসমূহ আলোচনা কর।

৩. বিশ্ব জনসংখ্যার লিঙ্গ অনুপাত ধারা বর্ণনা কর।

৪. পাঠে বর্ণিত বাংলাদেশের লিঙ্গ কাঠামোর একটি ব্যাখ্যা কর।

পাঠ-৩.১১ জনসংখ্যা কাঠামো : বৈবাহিক কাঠামো

এই পাঠ শেষে আপনি-

- জনসংখ্যা কাঠামোর অন্তর্গত বৈবাহিক কাঠামো;
- বৈবাহিক অবস্থার জনমিতিক সম্পর্ক; এবং
- বৈবাহিক অবস্থার সাধারণ বিশ্ব চিত্র ধারনা লাভ করবেন।

বিবাহ নারী ও পুরুষের মধ্যে আইনগতভাবে সম্পর্কীয় ও সামাজিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে স্বীকৃত একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জনমিতিক অবস্থা। বয়স ও লিঙ্গ কাঠামোর মত এই বৈশিষ্ট জৈবিক সত্বাপূর্ণ নয়। বৈবাহিক কাঠামো পুরোপুরি একটি জনসংখ্যার বা জনগোষ্ঠীর অর্জিত বৈশিষ্ট্য। বিবাহ সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও ধর্মীয়ভাবে গ্রহণযোগ্য পরিবার সৃষ্টির মূল ভিত্তি। যেহেতু কোন পরিবারের বা জনগোষ্ঠীর প্রজননশীলতা বিবাহের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, সেহেতু জন্ম হারের পর্যায় নির্ণয়ে বৈবাহিক অবস্থা বা কাঠামোর বিন্যাস একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

বৈবাহিক বৈশিষ্ট্য প্রধানত তিন ধরনের নারী-পুরুষ সম্পর্কের সাথে যুক্ত :

(ক) এক বিবাহ - একজন পুরুষের সাথে একজন নারীর বৈবাহিক সম্পর্ক। এই বৈবাহিক সম্পর্ক বিশ্বে সর্বাধিক প্রচলিত;

(খ) বহুপত্নিক বিবাহ - একজন পুরুষের একাধিক স্ত্রী গ্রহণ। প্রধানত মুসলিম সাংস্কৃতিক অঞ্চলে এরূপ বৈবাহিক সম্পর্ক সীমিত আকারে প্রচলিত; এবং

(গ) বহু ভর্তৃক বিবাহ- একজন নারীর একাধিক স্বামী গ্রহণ। একাধিক স্বামী প্রধানত পরিবারভুক্ত একাধিক ভাই হয়ে থাকে। যে সব সমাজে বা জনগোষ্ঠীতে অতি উচ্চ লিঙ্গ অনুপাত (অর্থাৎ পুরুষ আধিক্য) বর্তমান, যেমন, হিমালয় অঞ্চল এবং দক্ষিণ ভারতের নীলগিরি এলাকার কিছু কিছু উপজাতির মধ্যে এই বৈবাহিক প্রথা দেখা যায়।

এছাড়া খৃষ্টীয় সাংস্কৃতিক অঞ্চলের কোন কোন এলাকায়, যেমন মধ্য ও ল্যাটিন আমেরিকায় (ক্যারিবীয় অঞ্চলসহ) এবং পাশ্চাত্য বিশ্বে সম্মত মিলন (Consensual Union) প্রথায় সীমিত নারী-পুরুষের মধ্যে পরিবার গঠনের প্রবণতা সম্প্রতি লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক বিবাহ প্রথা ব্যাতিরেকে এক-জোড়া নারী ও পুরুষ বহুদিন যাবৎ পারিবারিক জীবন অতিবাহিত এবং সন্তান-সন্ততি প্রতি পালন করতে পারে। প্রথাটি রাষ্ট্র ও সামাজিকভাবে বর্তমানে স্বীকৃত হলেও অনেক ক্ষেত্রে সন্তান গ্রহণের পর এরূপ অনেক দম্পতি এক পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে। এর কারণ প্রধানত বৃহত্তর সামাজিক ও ধর্মীয় অনুশাসনের সাথে যুক্ত মনে করা হয়। বৈবাহিক সম্পর্কের উপরে বর্ণিত শ্রেণীভাগের খ ও গ-কে একত্রে বহুগামী (Polygamy) সম্পর্ক বলা হয়।

সামগ্রীকভাবে নির্দিষ্ট সময়ে একটি জনসংখ্যার বৈবাহিক কাঠামোকে নিম্নরূপ শ্রেণীবিভাজন করা হয়ে থাকে, এবং জাতীয় আদম শুমারীতে গণনাকৃত হয়ে থাকে:

(ক) বিবাহিত

(খ) অবিবাহিত;

(গ) বিবাহ-বিচ্ছিন্ন :

(ঘ) বিধবা এবং বিপত্নীক;

(ঙ) তালাক প্রাপ্ত।

এই শ্রেণীবিভাজন জনসংখ্যার অনুপাতের পার্থক্য একটি দেশের জনমিতিক এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর বিবিধ ধরণের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। এগুলি বিশেষ করে নারী ও পুরুষের কর্ম কাঠামো ও কর্ম তৎপরতা, শিক্ষা গ্রহণের পর্যায়, অভিগমন প্রবণতা এবং বিশেষভাবে প্রজননশীলতা ও মরণশীলতাকে প্রভাবিত করে।

বৈবাহিক অবস্থার জনমিতিক সম্পর্ক

বৈবাহিক অবস্থার জনমিতিক তাৎপর্য যে কোন জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ গুরুত্ববহ। বৈবাহিক অবস্থাভেদে মৃত্যু ও অভিগমন হারের বিশেষ তারতম্য হয়ে থাকে। অবিবাহিত ও তালাক প্রাপ্তদের তুলনায় বিবাহিতদের মধ্যে মৃত্যু হার সাধারণভাবে কম। বৈবাহিক অবস্থা, বিশেষ করে সন্তান সংখ্যা ও সন্তানদের বয়সের সঙ্গে অভিগমনের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। ছোট ও স্কুল গামীহীন পরিবারের মধ্যে অভিগমনের প্রবণতা অধিক লক্ষ্য করা যায়। বৈবাহিক অবস্থার একক ও প্রধান গুরুত্ব হচ্ছে জন্ম হার সম্পর্কিত (তাহা, ১৯৮৯)। বিবাহের মাধ্যমেই নারী-পুরুষের দাম্পত্য জীবন শুরু হয়। সুতরাং জন্ম হারের ক্ষেত্রে বিবাহিতদের ভূমিকা অনন্য। উল্লেখ্য, প্রজনন প্রক্রিয়ায় নারীদের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। প্রজননের ক্ষেত্রে নারীগণ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত এবং নারীদের প্রজননকালও সুনির্দিষ্ট। সাধারণভাবে ১৫ থেকে ৪৯ বৎসর বয়সের মধ্যেই নারীদের প্রজননকাল সীমিত। তবে ২০ থেকে ৩০ বৎসর মধ্যে নারীদের সন্তান জন্ম দানের হার সর্বাধিক এবং মোট সন্তান জন্মদানের ৭০ শতাংশ সন্তান এই বয়স সীমার মধ্যে জন্মগ্রহণ করে থাকে। স্বাভাবতই কোন জনসংখ্যায় বিবাহিত নারীর অনুপাত এই বয়সসীমার মধ্যে অধিক হলে এবং গড় বিবাহ বয়স কম হলে সন্তান ধারণের সম্ভাব্যতা বৃদ্ধি পায়; ফলে এরূপ জনসংখ্যায় জন্ম হার উচ্চ হয়ে থাকে। প্রায় সকল বিকাশশীল দেশে এবং মুসলিম দেশ সমূহে এরূপ অবস্থা দেখা যায়। অপরদিকে উন্নত দেশসমূহে এর বিপরীত অবস্থার কারণে নিম্ন জন্ম হার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন জনসংখ্যার বৈবাহিক কাঠামো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বিকাশশীল দেশের তুলনায় উন্নত দেশ সমূহে অবিবাহিত নারীর অনুপাত অপেক্ষাকৃত বেশী। ২০১০ সালে যুক্তরাষ্ট্র ২৫-২৯ বয়স শ্রেণীতে ৭৮ শতাংশ নারী বিবাহিত এবং পারিবারিক জীবন যাপন করেছিল। ২০১০ সালে বাংলাদেশে একই বয়সশ্রেণীতে প্রায় ৯৪ শতাংশ নারী বিবাহিত ছিল। উন্নত ও বিকাশীল দেশসমূহে বৈবাহিক অবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে বিবাহে নারীদের বয়সগত পার্থক্য। উন্নত অঞ্চলে নারীদের প্রথম বিবাহের গড় বয়স প্রায় ২৫ বৎসর ছিল। বিকাশশীল দেশে এই বয়স ছিল ১৫ থেকে ১৭ বৎসরের মধ্যে। বাংলাদেশে এই বয়স ছিল প্রায় ১৭ বৎসর (১৯৯১) এবং ভারতে ১৮ বৎসর বর্তমানে বাংলাদেশে এই বয়স ১৮ বৎসর (২০১০) বিকাশশীল দেশে এরূপ নিম্ন বিবাহ বয়স এবং বিস্তৃত সন্তান ধারণ কাল উচ্চ জন্ম হারের প্রধান কারণ বলা যেতে পারে।

বৈবাহিক অবস্থার সাধারণ বিশ্ব চিত্র

বিংশ শতাব্দীতে উন্নত ও বিকাশশীল উভয় অঞ্চলেই বৈবাহিক অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। এই পরিবর্তনগুলির মধ্যে অবিবাহিত ও বিবাহিতদের গড় বয়সগত পরিবর্তন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অতীতে অবিবাহিত বা কৌমার্য ছিল উন্নত বিশ্বের বৈবাহিক কাঠামোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য (তাহা, ১৯৮৯)। ১৮৯০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ১৪ বৎসর ও তদুর্ধ বয়স্ক পুরুষদের প্রায় ৪৪ শতাংশ এবং নারীদের প্রায় ৩৪ শতাংশ অবিবাহিত ছিল। এই সময়ে ২০-২৪ বৎসর বয়:শ্রেণীতে পুরুষদের মধ্যে

অবিবাহিত হার ছিল ৮১ শতাংশ এবং নারীদের মধ্যে প্রায় ৫২ শতাংশ। ১৯৬০ সালে এই বয়:শ্রেণীতে পুরুষ ও নারীদের মধ্যে অবিবাহিত ছিল যথাক্রমে ৫৩ ও ২৮ শতাংশ। অপরদিকে, ১৯২০ সালে ৩৫-৪৪ বয়:শ্রেণীতে নারীদের মধ্যে তালাকপ্রাপ্তাদের হার ছিল মাত্র ১ শতাংশ (তাহা, ১৯৮৯)। ১৯৯৫ সালে তা কয়েক গুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৯৫ সালে ২৫–২৯ বয়:শ্রেণীতে নারীদের মধ্যে ১৪ শতাংশ তালাকপ্রাপ্তা ছিল। বিকাশশীল দেশে এই দুই অবস্থার বিপরীত চিত্র দেখা গেছে। বিবাহের বয়সগত পরিবর্তন ও সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। উন্নত বিশ্বে বর্তমানের তুলনায় ১০০ বৎসর পূর্বে পুরুষ ও নারীর উভয়েরই বিবাহ বয়স যথেষ্ট বেশী ছিল। ১৯২৬ সালে আয়ারল্যান্ডে নারী ও পুরুষদের বিবাহের মধ্যমা বয়স ছিল যথাক্রমে ২৭ ও ৩১ বৎসর। ১৯৩০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে এই বয়স ছিল যথাক্রমে ২১ ও ২৪ বৎসর। ইউরোপে নারীদের উচ্চ মধ্যমা বিবাহ বয়স (২৫-৩০ বৎসর) হাঙ্গেরী, অষ্ট্রিয়া, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, নরওয়ে এবং ইংল্যান্ডে দেখা যায়। সাম্প্রতিক দশকসমূহে এই বয়স প্রায় সমগ্র উন্নত বিশ্বে হ্রাস পাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৪১ সালে হাঙ্গেরীতে নারীদের প্রথম বিবাহ বয়স ছিল ২৭ বৎসর ১৯৬০ সালে এই বয়স ছিল ২০ বৎসর, এবং ১৯৯৫ সালে ১৯.৫ বৎসর। ১৯০০ সালে সুইডেনে এবং অস্ট্রিয়ায় নারীদের প্রথম বিবাহ বয়স ছিল যথাক্রমে ২৬ ও ২৬.২ বৎসর; ১৯৯৫ সালে অস্ট্রিয়ায় এই বয়স ছিল ২২ এবং সুইডেন ২২.৫ বৎসর।

বিকাশশীল দেশসমূহে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে নিম্ন বিবাহ বয়স নারীদের জন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল। তবে পুরুষদের বিবাহ বয়সও যথেষ্ট কম ছিল। উদাহরণ স্বরূপ, শ্রীলংকা এবং মিশরে ১৯০১ সালে নারীদের প্রথম বিবাহ বয়স ছিল ১৬.৪ বৎসর, ১৯৯৫ সালে প্রায় ২০ বৎসরে বৃদ্ধি পায়। মিসরে ১৯৪৭ সালে নারীদের প্রথম বিবাহ বয়স ছিল ১৮ বৎসর, ১৯৬০ সালে ১৯ এবং ২০১০ সালে ২০ বৎসরে দাঁড়ায়। বিকাশশীল প্রায় দেশে এরূপ ধারা লক্ষ্য করা যায়।

দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতে ১৯০১ সালে নারীদের প্রথম বিবাহ বয়স ছিল ১৭ বৎসর, ১৯৬১ এই বয়স ছিল ১৭.৫ বৎসর এবং বর্তমানে প্রায় ১৮ বৎসর। বর্তমানে পুরুষদের এই বয়স ২৩.৮ বৎসর। বাংলাদেশেও অনুরূপ বিবাহ বয়সের ধারা লক্ষ্য করা যায়।

সারণী ৩.১১.১: বাংলাদেশের বৈবাহিক কাঠামো

বাংলাদেশে বৈবাহিক কাঠামো, ১৯২১-২০০৮

সাল	অবিবাহিত		বিবাহিত		বিধবা তালাক প্রাপ্ত/ বিপত্নীক		গড় বিবাহ বয়স (বৎসর)	
	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
১৯২১	৫১.৮০	৩৪.৩০	৪৪.৪০	৪৬.০০	৩.৮০	১৯.৭০	২১.৯০	১২.৩০
১৯৩১	৪৬.৯০	৩১.০০	৪৯.৮০	৫১.৪০	৩.৩০	১৭.৬০	১৮.৭০	১০.৮০
১৯৪১	৪৭.৯৬	৩৯.৪৮	৪৯.৩২	৪৩.৮২	৩.৭২	১৬.৭০	২১.৭০	১৩.৪০
১৯.৫১	৫৪.৯৬	৪০.৬৯	৪২.০০	৪৬.৫৮	৩.০৩	১২.৭২	২২.৪০	১৪.৪০
১৯৬১	৫৭.৩৪	৪৪.৬৪	৪০.৪১	৪৩.৬৯	২.২৪	১১.৬৭	২২.৬০	১৪.৯০
১৯৭৪	৪৩.৩০	২৩.৪০	৫৩.৯০	৬১.২০	২.৮০	১৪.৪০	২৪.০০	১৫.০০
১৯৮১	৪২.৮০	২৩.৭০	৫৫.৯০	৬৩.৪০	১.৩০	১২.৭০	২৫.৮০	১৭.৮০
১৯৯১	৪২.১০	২৫.২০	৫৭.২০	৬৪.৮০	০.৭০	১০.০০	২৫.২০	১৮.১০
২০০১	২৯.৪০	১৪.৪০	৬৯.৯০	৯৩.০০	-	-	২৫.২০	১৯.০০
২০০৮	৩১.৫৯	৫.৮৬	৬৭.৬৭	৯১.৫৬	-	-	২৩.৮০	১৮.৭০

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেট বই ২০০৯

উন্নত বিশ্বে গড় বিবাহ বয়সের হ্রাসের কারণ হচ্ছে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে অর্থনৈতিকভাবে আত্মনির্ভরশীলতা এবং জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনার ব্যাপক উন্নয়ন। একই সাথে নারী শিক্ষার প্রসারের ফলে লিঙ্গ সমতা (Gender Equity), বৈবাহিক অবস্থা সম্পর্কে নারীদের স্বকীয় ভূমিকার প্রভাব বিশেষ গুরুত্ববহ মনে করা হয়। অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরশীলতা এবং পেশাগত ক্ষেত্রে লিঙ্গ-সমতা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এবং নারী-পুরুষ উভয়ের বৈবাহিক বন্ধনের ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান। অপরদিকে, বিবাহের প্রতিকূল অবস্থা থেকে পরিত্রাণের ক্ষেত্রে জন্ম নিরোধক ব্যবস্থার ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে। বিকাশশীল কতিপয় দেশে বিবাহের বয়স বৃদ্ধির কারণ সুস্পষ্ট নয় তবে শিক্ষার বিস্তার, সনাতন পরিবার গঠনের ক্রম পরিবর্তন, নারীর কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, লিঙ্গ বৈষম্য সচেতনতায় থাইল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কিছু দেশে নারীদের গড় বিবাহ বয়স বৃদ্ধিতে প্রভাব রেখেছে। বাংলাদেশেও এধরণের চিত্র দেখা যাচ্ছে। তবে পুরুষদের গড় বিবাহ বয়সের তেমন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাম্প্রতিক কালে দেখা যাচ্ছে না।

পাঠসংক্ষেপ:

বিবাহ নারী ও পুরুষের মধ্যে আইনগতভাবে সম্পর্কীয় ও সামাজিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে স্বীকৃত একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জনমিতিক অবস্থা। যেহেতু কোন পরিবারের বা জনগোষ্ঠীর প্রজননশীলতা বিবাহের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, সেহেতু জন্ম হারের পর্যায় নির্ণয়ে বৈবাহিক অবস্থা বা কাঠামোর বিন্যাস একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই পাঠে জনসংখ্যার কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত বৈবাহিক কাঠামো সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ৩.১১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন:

১. শূন্যস্থান পূরণ করুন:

১.১. বিবাহ নারী ও পুরুষের মধ্যে আইনগতভাবে সম্পর্কীয় ও সামাজিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে স্বীকৃত একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ------- ।

১.২. বৈবাহিক বৈশিষ্ট্য প্রধানত ------- ধরনের নারী-পুরুষ সম্পর্কের সাথে যুক্ত।

১.৩. সাধারণভাবে ১৫ থেকে ------- বৎসর বয়সের মধ্যেই নারীদের প্রজননকাল সীমিত।

১.৪. ২০ থেকে ৩০ বৎসরের মধ্যে নারীদের সন্তান জন্ম দানের হার সর্বাধিক এবং মোট সন্তান জন্মদানের ৭০ শতাংশ সন্তান এই বয়স সীমার মধ্যে জন্মগ্রহণ করে থাকে।

১.৫. বিকাশশীল দেশসমূহে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ------- বিবাহ বয়স নারীদের জন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১. জনমিতিক পরিবৃদ্ধিকাল তত্ত্ব বা ধারা কাকে বলা হয়?

২. জনমিতিক পরিবৃদ্ধিকাল তত্ত্ব পর্যায় সমূহের বৈশিষ্ট্য কি কি?

রচনামূলক প্রশ্ন:

১. বৈবাহিক কাঠামোর বিভিন্ন প্রকরণগুলি কি? বৈবাহিক অবস্থার জনমিতিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।

২. বিশ্ব জনসংখ্যার বৈবাহিক অবস্থা বর্ণনা কর।

পাঠ-৩.১২ জনসংখ্যা কাঠামো : অর্থনৈতিক কাঠামো

এই পাঠ শেষে আপনি-

- জনসংখ্যা কাঠামোর অন্তর্গত অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পর্কে জানতে পারবেন।

অর্থনৈতিকভাবে কর্মক্ষম জনসংখ্যা বা শ্রমশক্তি নানাভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়:

(ক) কর্মক্ষম বয়সসীমা জনসংখ্যা: ব্যহত বয়স্ক জনসংখ্যা (১৫-৫৯ বৎসর);

(খ) কর্মী জনসংখ্যা: নারী ও পুরুষ জনসংখ্যা যারা সাধারণত কর্মে নিয়োজিত থাকে কিন্তু সাময়িকভাবে কর্মহীন থাকতে পারে;

(গ) কর্মে নিয়োজিত জনসংখ্যা: নির্দিষ্ট সময়ে প্রকৃতপক্ষে উৎপাদনশীল কর্মপ্রক্রিয়া জড়িত জনসংখ্যা। সাময়িকভাবে কর্মহীন বা বেকার জনসংখ্যাসহ এই শ্রেণী কর্মী জনসংখ্যায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে।

জাতিসংঘের সংজ্ঞা অনুযায়ী একটি জনসংখ্যায় অর্থনৈতিক কাঠামো ব্যাখ্যায় কর্মী জনসংখ্যা বলতে নিম্ন বর্ণিত ব্যক্তিবর্গকে বুঝায়:

(ক) পারিশ্রমিকহীন পরিবার ভিত্তিক কর্মীসহ নিয়োগকর্তা, কর্মে নিয়োজিত এবং স্বনিয়োজিত শ্রমিক বা কর্মী;

(খ) বেসামরিক এবং সামরিক বাহিনীর সদস্যবৃন্দ;

(গ) কর্মে নিয়োজিত, কর্মহীন বা বেকার ব্যক্তিবর্গ এবং প্রথম কর্মসন্ধানী জনসংখ্যা;

(ঘ) খন্ডকালীন অর্থনীতিক কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ; এবং

(ঙ) গৃহ পরিচারকগণ।

কাজেই অকর্মী জনসংখ্যা কেবল কর্মক্ষম বয়সীমার নিচে (০-১৪ বৎসর) এবং অবসর প্রাপ্ত সদস্যদেরই বুঝায় না, শিক্ষার্থী, গৃহবধূ, কারাগার বন্দী, পেনসন ভোগী, অনুদান বা ভাতা ভোগকারীদেরও বুঝায়। সাধারণভাবে অকর্মী এবং কর্মী জনসংখ্যা পার্থক্যকরণ করা হয়ে থাকে পেশা দ্বারা।

পেশা

অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের গুরুত্বপূর্ণ সূচক হচ্ছে পেশা। পেশার সুদূর প্রসারী জনমিতিক তাৎপর্যও রয়েছে। উচ্চতর পেশাজীবিদের মধ্যে জন্ম ও মৃত্যু হার সাধারণত: কম দেখা যায়। পক্ষান্তরে কৃষক, শ্রমিক, মৎস্যজীবী প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে জন্ম ও মৃত্যু হার অপেক্ষাকৃত বেশী দেখা যায়। পেশাভেদে কর্মপরিমন্ডল, স্বাস্থ্যগত পরিবেশ, শ্রমবিনিয়োগ, আবাসিকতা, শ্রমও বিশ্রামের নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি বিষয়ে যে তারতম্য হয় সে সমস্ত কারণেই বিভিন্ন পেশাজীবীদের মধ্যে জন্ম ও মৃত্যু হারের তারতম্য হয়ে থাকে (তাহা, ১৯৮৯)। স্বাভাবতই জনসংখ্যার উপাদান বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পেশাগত বৈশিষ্ট্য মূল্যায়নের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। উল্লেখ্য, মানুষের পেশা অত্যন্ত বিচিত্রধর্মী ও বিভিন্ন মুখী। আধুনিক

শিল্পোন্নত একটি দেশে প্রায় ১০ থেকে ৫০ হাজার বিভিন্ন পেশা দেখা যায়। শ্রেণীবিভাজন ও বিশ্লেষণের সুবিধার্থে এই ব্যাপক সংখ্যা কমিয়ে এনে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) পেশার সরলীকৃত বিন্যাস করেছে।

এগুলো নিচে প্রকাশ করা হলো:

১. বৃত্তিমূলক ও কারিগরী পেশা;
২. ব্যবস্থাপনা, প্রশাসনিক ও কারণিকের পেশা;
৩. বিপণন পেশা;
৪. কৃষক, মৎস্যজীবী, কাঠুরিয়া, পশু-পাখী শিকারী;
৫. খনি শ্রমিক, খনি খনক ও অনুরূপ পেশা;
৬. পরিবহন সংক্রান্ত পেশা;
৭. মিস্ত্রি, উৎপাদনকর্মী, শিল্প শ্রমিক ইত্যাদি পেশা;
৮. পরিচর্যামূলক পেশা;
৯. সৈনিক ও প্রতিরক্ষা সংশ্লিষ্ট পেশা: এবং
১০. অন্যান্য/বিবিধ।

এই বিন্যাস অনুযায়ী বিশ্বের প্রায় সকল দেশে আদমশুমারীতে পেশাভিত্তিক জনসংখ্যা বিধৃত হয়। তবুও উপরে প্রদত্ত পেশার শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কে অনেকে ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁদের মতে এই শ্রেণী বিন্যাস পেশা ও কর্মক্ষেত্র বা শিল্পের সংমিশ্রণ ঘটেছে (তাহা ১৯৮৯)। উল্লেখ্য, পেশা বলতে কর্মের বৈশিষ্ট্যকে বুঝায়। অন্যদিকে কর্ম যে স্থানে বা পরিমন্ডলে ঘটে তাকে কর্মক্ষেত্র বা শিল্প বলে। একজন শ্রমিক কৃষি ক্ষেত্র কিংবা শিল্প ক্ষেত্রেও কাজ করতে পারে। লক্ষ্যণীয় যে কর্মক্ষেত্রের চেয়ে পেশারই জনমিতিক গুরুত্ব সমধিক। তবে বিশুদ্ধ পেশাগত তথ্যের বিশেষ অভাব রয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে কর্মক্ষেত্রের ভিত্তিতেও পেশাগত তথ্যাদি প্রকাশ করা হয়ে থাকে। তথ্যের সীমাদ্ধতা সত্বেও মোটামুটি লক্ষ্য করা যায় যে, উন্নত বিশ্বে মোট শ্রমশক্তির প্রায় ১০.৩ শতাংশ কৃষিতে, ২১.৭ শতাংশ শিল্প ও ব্যবসায় এবং ৪১ শতাংশ পরিচর্যা বা সেবামূলক পেশায় নিয়োজিত। উত্তর আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপের কতিপয় দেশে কৃষিখাতে নিয়োজিত শ্রমশক্তির হার ৫ শতাংশের কম। এ সমস্ত দেশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে যুক্তরাজ্য, বেলজিয়াম, যুক্তরাষ্ট্র এবং জার্মানী। ২০১০ সালে যুক্তরাজ্যে কৃষিখাতে নিয়োজিত শ্রম শক্তির হার ছিল মাত্র ১.৫ শতাংশ। বেলজিয়ামে এই হার ছিল ৩ শতাংশ, যুক্তরাষ্ট্রে ৩ শতাংশ, নেদারল্যান্ডে এবং জার্মানীতে ৫ শতাংশ।

উন্নত বিশ্বে কৃষিকাজে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা খুব কম এবং জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান খুবই সামান্য (সারণী ৩.১২.১)। অন্যদিকে আফ্রিকা, দক্ষিণ এশিয়া ও পূর্ব এশিয়ায় জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান উন্নত বিশ্বের তুলনায় বেশি। উন্নত বিশ্বে (যুক্তরাষ্ট্রের জিডিপিতে সেবাখাতের অবদান ৭৭ শতাংশ) শিল্প ও সেবা খাতে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা অনেক বেশি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ দেশগুলোতে (সৌদি আরবের অর্থনীতিতে শিল্প খাতের অবদান ৭০ শতাংশ) শিল্প খাতে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা অনেক বেশি। বর্তমানে বৈষয়িক জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কৃষিতে বিরূপ প্রভাব ফেলছে এবং সামগ্রিক অর্থনীতিতে এর

নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। অন্যদিকে শিল্প ও সেবাখাতের দ্রুত প্রসারের ফলে এ খাতে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সারণী ৩.১২.১: বিভিন্ন দেশে অর্থনীতিতে বিভিন্ন ঘাতের অবদান ২০১০

দেশের নাম	কৃষিখাত	শিল্প খাত	সেবা খাত	দেশের নাম	কৃষি খাত	শিল্প খাত	সেবা খাত
চীন	১১	৪৯	৪০	দক্ষিণ আফ্রিকা	৩	৩১	৬৬
ভারত	১৮	২৯	৫৩	জাম্বিয়া	২১	৪৬	৩৩
বাংলাদেশ	১৯	২৯	৫২	সুইডেন	২	২৯	৭০
জাপান	১	৩০	৬৮	জার্মানী	১	৩০	৬৯
সৌদি আরব	২	৭০	২৭	বেলজিয়াম	১	২৪	৭৫
উজবেকিস্তান	২৩	৩৩	৪৩	মালি	৩৭	২৪	৩৯
ইন্দোনেশিয়া	১৪	৪৮	৩৭	যুক্তরাষ্ট্র	১	২২	৭৭
মিশর	১৪	৩৬	৫০	মেক্সিকো	৪	৩৭	৫৯
সুদান	২৬	৩৪	৪০	ব্রাজিল	৭	২৮	৬৫
নাইজেরিয়া	৩১	৪১	২৮	আর্জেন্টিনা	৯	৩৪	৫৭
ঘানা	৩২	২৬	৪২	বলিভিয়া	১৪	৪২	৪৪
কেনিয়া	২১	১৩	৬৫	পেরু	৭	৩৮	৫৫

উৎস : World Development Report 2010

পেশাগত বৈশিষ্ট্য অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের বৈচিত্রই শুধু প্রকাশ করে না, অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাও নির্দেশ করে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে পেশাগত বন্টনের বিশেষ পরিবর্তন ঘটে। এ ধরনের পরিবর্তনের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কৃষি ও অন্যান্য প্রাথমিক কর্মকান্ডে শ্রম হারের হ্রাস এবং বৃত্তিমূলক, কারিগরী ও কারনিক পেশায় আপেক্ষিক বৃদ্ধি। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে অদক্ষ গৃহ পরিচর্যামূলক পেশার ক্ষেত্রেও ধন্ত্রক পরিবর্তন ঘটে (তাহা, ১৯৮৯)।

পাঠসংক্ষেপ:

এই পাঠে আমরা জনসংখ্যা কাঠামোর অন্তর্গত অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছি। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের গুরুত্বপূর্ণ সূচক হচ্ছে পেশা। জনসংখ্যার উপাদান বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পেশাগত বৈশিষ্ট্য মূল্যায়নের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। পেশাগত বৈশিষ্ট্য অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের বৈচিত্রই শুধু প্রকাশ করে না, অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাও নির্দেশ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৩.১২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. সত্য হলে 'স' মিথ্যা হলে 'মি' লিখুনঃ

১.১. অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের গুরুত্বপূর্ণ সূচক হচ্ছে পেশা।

১.২. আধুনিক শিল্পোন্নত একটি দেশে প্রায় ৫ থেকে ৫০ হাজার বিভিন্ন পেশা দেখা যায়।

১.৩. উন্নত বিশ্বে মোট শ্রমশক্তির প্রায় ১০ শতাংশ কৃষিতে, ৪০ শতাংশ শিল্প ও ব্যবসায় এবং ৫০ শতাংশ পরিচর্যা বা সেবামূলক পেশায় নিয়োজিত।

১.৪. অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে পেশাগত বন্টনের বিশেষ পরিবর্তন ঘটে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১. জনমিতিক পরিবৃদ্ধিকাল তত্ত্ব বা ধারা কাকে বলা হয়?

২. জনমিতিক পরিবৃদ্ধিকাল তত্ত্ব পর্যায় সমূহের বৈশিষ্ট্য কি কি?

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার ও জনসংখ্যা আকারে বিশ্ব পর্যায়ের সম্পর্ক নির্দেশ কর।

২. জনমিতিক পরিবৃত্তিকাল তত্ত্বটি আলোচনা কর।

৩. সংক্ষেপে বিশ্ব জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ভবিষ্যত সম্পর্কে আলোচনা কর।

পাঠ-৩.১৩ জনসংখ্যা কাঠামো : শিক্ষা কাঠামো

এই পাঠ শেষে আপনি-

- জনসংখ্যা কাঠামোর অন্তর্গত শিক্ষা কাঠামো; এবং
- শিক্ষিতের বিশ্ব বিন্যাস সম্পর্কে ধারনা লাভ করবেন।

জনসংখ্যার সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক হচ্ছে শিক্ষিতের হার এবং শিক্ষার পর্যায়। আর্থ-সামাজিক আধুনিকায়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে শিক্ষা। কেননা প্রায় সকল জনমিতিক বৈশিষ্ট্য, যেমন, বিবাহ, প্রজননশীলতা, মরণশীলতা, অভিগমন, শ্রমশক্তি প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা দ্বারা প্রভাবিত হয়। শিক্ষার প্রভাবের কারণেই উন্নত ও বিকাশশীল দেশ সমূহের মধ্যে উপরোক্ত জনমিতিক অবস্থার পার্থক্য লক্ষণীয়ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, বিকাশশীল দেশে নারীদের নিম্ন গড় বিবাহ বয়স এবং শ্রমশক্তিতে সীমিত অংশ গ্রহণ নিম্ন শিক্ষা হারের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এর বিপরীত অবস্থা উন্নত দেশে দেখা যায়। একই কারণে বিকাশশীল দেশে উচ্চ শিশুমৃত্যু হার নারীদের নিম্ন শিক্ষা হারের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এই ধরণের সম্পর্ক নারীদের নিম্ন পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ হার, উচ্চ প্রজননশীলতা ও মরণশীলতা বিকাশশীল দেশে দেখা যায়।

উল্লেখ্য যে, শিক্ষা ব্যবস্থার ভিন্নতার কারণে জনসংখ্যার শিক্ষাগত বৈশিষ্ট্যের আন্তর্জাতিক তুলনা করার বিশেষ অসুবিধা রয়েছে। এ সমস্যার প্রধান কারণ হচ্ছে শিক্ষিতের সংজ্ঞার মধ্যে অসমতা এবং শিক্ষিতের গণনায় শিশুদের অন্তর্ভুক্তির প্রশ্ন। শিক্ষিত বলতে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বোঝানো হয়ে থাকে। তবে আন্তর্জাতিক তুলনার সুবিধার্থে শিক্ষিত বা স্বাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন (Literate) বলতে যে কোন ভাষায় বোধগম্যতার সাথে লিখতে এবং পড়তে সক্ষম ব্যক্তিদের বুঝিয়ে থাকে। শিক্ষিতের গণনায় সাধারণত: শিশু ও অপ্রাপ্ত বয়স্কদের বাদ দেওয়া হয়ে থাকে। অপ্রাপ্ত বয়স্কদের বয়সসীমা সম্পর্কে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে যথেষ্ট তারতম্য রয়েছে। সাধারণত: এই সীমা ৫ থেকে ১৫ বৎসর পর্যন্ত বিস্তৃত। উন্নত বহুদেশে শিক্ষিত গণনার ক্ষেত্রে ১৫ অথবা ১২ বৎসরের কম বয়স্ক শিশুদের বাদ রাখা হয়। বিকাশশীলদেশে এই সীমা ৫ অথবা ১০ বৎসর পর্যন্ত ধরা হয়ে থাকে। বাংলাদেশে ৫ বৎসরের কম বয়স্কদের শিক্ষিত গণনার বাইরে রাখা হয়েছে। আবার কখন কখন মোট জনসংখ্যা ধরেই (শিশুসহ) শিক্ষিতের হার নির্ণয় করা হয়েছে।

শিক্ষিতের বিশ্ব বিন্যাস

বিশ্বব্যাপী শিক্ষিতের বিন্যাসে যথেষ্ট ভিন্নতা রয়েছে (সারণী ৩.১৩.১)। উন্নত বিশ্বে শিক্ষিতের হার ৯৮ থেকে ১০০% এর মধ্যে; দক্ষিণ ইউরোপের কয়েকটি দেশে এই হার কিছুটা কম। এই দেশগুলির মধ্যে পর্তুগাল, যুগোস্লাভিয়া, আলবেনিয়া এবং মাল্টার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ২০১০ সালে আলবেনিয়ায় শিক্ষিতের হার ছিল ৯৯%, উন্নত বিশ্বে সর্বনিম্ন হার। ২০১০ সালে পর্তুগালে শিক্ষিতের হার ছিল প্রায় ৯৫% যুগোশ্লাভিয়ার ৯৯%, এবং মাল্টার ৯১%। বিকাশশীল অঞ্চলে ল্যাটিন আমেরিকা এবং পূর্ব ও দক্ষিণ ইউরোপে শিক্ষিতের হার তুলনামূলকভাবে বেশি। ২০১০ কিউবায় শিক্ষিতের হার

ছিল প্রায় ১০০%। এশিয়া মহাদেশে ২০১০ সালে উত্তর কোরিয়ায় শিক্ষিতের হার ছিল প্রায় ৯৮%, ফিলিপাইনে ৯৩% এবং থাইল্যান্ডে ৯৪% সিংঙ্গাপুরে ৯৪%। বিকাশশীল অঞ্চলের মধ্যে মধ্য আফ্রিকা, দক্ষিণ এশিয়া এবং ক্যারিবীয় কোন কোন দ্বীপে শিক্ষেতের হার নিতান্তই অল্প। এই সমস্ত দেশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সেনেগাল, গাম্বিয়া, নাইজার, চাঁদ, সুদান, ইথিওপিয়া; আফগানিস্তান, পাকিস্তান, নেপাল, ভূটান এবং হাইতি। মধ্য আফ্রিকার দেশসমূহে শিক্ষিতের হার ৩০% এর নীচে। সেনেগাল, নাইজার, বুরকিনা ফাসো, বেনিন প্রভৃতি দেশে এই হার ২০ থেকে ৪০ শতাংশের মধ্যে। এশিয়ায় শিক্ষিতের হার ২৫ থেকে ৪০% এর মধ্যে। আফগানিস্তান, ভূটান ও শ্রীলংকা এর ব্যতিক্রম। আফগানিস্তানে ২৮% এবং ভুটানে শিক্ষিতের হার প্রায় ৫৩ শতাংশ, শ্রীলংকায় শিক্ষিতের হার ২০১০ সালে ছিল ৯১%, বাংলাদেশে এই হার ৫৩% (সারণী ৩.১৩.১)।

সারণী ৩.১৩.১: নির্বাচিত দেশসমূহে শিক্ষিতের হার, ২০১০

দেশ	শতাংশ	দেশ	শতাংশ
আফগানিস্তান	২৮	ভারত	৬৬
আলবেনিয়া	৯৯	ইরাক	৭৪
আর্জেন্টিনা	৯৮	জাপান	৯৯
বাংলাদেশ	৫৩	মাল্টা	৯১
বেনিন	৪০	নেপাল	৫৭
ভূটান	৫৩	পাকিস্তান	৫৪
বুরকিনা ফাসো	১৮	ফিলিপাইন্স	৯৩
চাঁদ	৬১	পর্তুগাল	৯৫
চিলি	৯৬	সেনেগাল	৪২
কিউবা	১০০	শ্রীলঙ্কা	৯১
ইথিওপিয়া	৩৬	সুদান	৬১
গাম্বিয়া	৩০	থাইল্যান্ড	৯৪
গ্রীস	৯৭	যুক্তরাজ্য	৯৯
হাইতি	৬২	যুক্তরাষ্ট্র	৯৯
যুগোস্লাভিয়া	৯৯	অস্ট্রেলিয়া	৯৯

উৎস : World Bank Development Report 2010

শিক্ষার বিষয়ে নারী ও পুরুষ এবং শহর ও গ্রামের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। আফ্রিকার বহুদেশে গ্রামীন নারীদের মধ্যে শিক্ষার সামান্যই বিস্তার ঘটেছে। বাংলাদেশে ২০১০ সালের হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় যে, পুরুষদের মধ্যে শিক্ষিতের হার হচ্ছে প্রায় ৩৯% নারীদের মধ্যে ২৬%। শহরে শিক্ষিতের হার ৫১%, গ্রামাঞ্চলে ২২%, শহরে পুরুষদের মধ্যে শিক্ষিতের হার সর্বাধিক প্রায় ৬০%। শহরে নারীদের মধ্যে এই হার প্রায় ৩৫%। গ্রামাঞ্চলে পুরুষদের মধ্যে শিক্ষিতের হার প্রায় ৩০% নারীদের মধ্যে মাত্র ২০%। ২০১০ সালে ভারতে পুরুষদের মধ্যে শিক্ষিতের হার ছিল প্রায় ৫০% নারীদের মধ্যে এই হার ছিল প্রায় ৩০%।

উন্নত বিশ্বে, দক্ষিণ ইউরোপ ব্যতিত শিক্ষিতের লিঙ্গগত পার্থক্য সামান্যই রযেছে। ২০১০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২% এর নীচে লোক অশিক্ষিত ছিল; পুরুষদের মধ্যেই অশিক্ষিতের হার বেশী ছিল প্রায় ২.০, নারীদের মধ্যে অশিক্ষিতের হার ছিল ১.৫ মাত্র। দক্ষিণ ইউরোপের দেশগুলিতে পুরুষ ও নারীদের মধ্যে শিক্ষাগত বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য এখনও রয়েছে। ২০১০ সালে গ্রীসে পুরুষদের মধ্যে শিক্ষিতের হার ছিল প্রায় ৯৮%, কিন্তু নারীদের মধ্যে এই হার ছিল প্রায় ৯১ শতাংশ।

পাঠসংক্ষেপ:

জনসংখ্যার সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক হচ্ছে শিক্ষিতের হার এবং শিক্ষার পর্যায়। শিক্ষা ব্যবস্থার ভিন্নতার কারণে জনসংখ্যার শিক্ষাগত বৈশিষ্ট্যের আন্তর্জাতিক তুলনা করার বিশেষ অসুবিধা রয়েছে। বিশ্বব্যাপী শিক্ষিতের বিন্যাসে যথেষ্ট ভিন্নতা রয়েছে। শিক্ষার বিষয়ে নারী ও পুরুষ এবং শহর ও গ্রামের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ৩.১৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন:

১. শূন্যস্থান পূরণ করুন:

১.১. শিক্ষা ব্যবস্থার ভিন্নতার কারণে জনসংখ্যার শিক্ষাগত বৈশিষ্ট্যের আন্তর্জাতিক ------- করার বিশেষ অসুবিধা রয়েছে।

১.২. উন্নত বিশ্বে শিক্ষিতের হার -------- থেকে ১০০% এর মধ্যে।

১.৩. এশিয়ায় শিক্ষিতের হার -------- থেকে ৪০% এর মধ্যে।

১.৪. উন্নত বিশ্বে, দক্ষিণ -------- ব্যতিত শিক্ষিতের লিঙ্গগত পার্থক্য সামান্যই রয়েছে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১. সূচক কি?

২. উন্নত বিশ্বে শিক্ষিতের বিশ্ববিন্যাস কেমন?

৩. বিকাশশীল অঞ্চলে শিক্ষিতের বিশ্ববিন্যাস কেমন?

৪. মধ্য আফ্রিকায় শিক্ষিতের বিশ্ববিন্যাস কেমন?

৫. বাংলাদেশের ২০০১ সালের গণনা অনুযায়ী শিক্ষার ধারা কেমন?

রচনামূলক প্রশ্ন:

১. জনসংখ্যা কাঠামোর অন্তর্গত অর্থনৈতিক কাঠামোর বর্ণনা দিন।

২. পেশা কি? বিশ্ব শ্রম শক্তির সাধারণ বন্টন দেখান।

পাঠ-৩.১৪ জনসংখ্যা কাঠামো : ভাষা

এই পাঠ শেষে আপনি-

- জনসংখ্যা কাঠামোর অন্তর্গত ভাষা;
- ভাষা পরিবার ও ভাষা গোষ্ঠী;
- প্রধান ভাষা গোষ্ঠী; এবং
- ভাষা ও রাজনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে ধারনা লাভ করবেন।

মানব জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভাষা সার্বজনীন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ; কিন্তু ভাষার ব্যাপক বিভিন্নতা রয়েছে। এতদসত্বেও ভাষা জনগোষ্ঠীর একটি প্রধান ও উল্লেখযোগ্য অর্জিত জনমিতিক বৈশিষ্ট্য। জনমিতিক প্রক্রিয়ায় ভাষার প্রত্যক্ষ কোন ভূমিকা না থাকলেও জাতি বা বর্ণসত্ত্বার আগে যেহেতু তা সম্পৃক্ত সেহেতু সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের কারণে ভাষাগত বৈশিষ্ট্য জনসংখ্যার বিশেষ করে আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যকে প্রভাবিত করার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে জনমিতিক ধারার উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে।

ভাষা পরিবার ও ভাষা গোষ্ঠী

পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশ জুড়ে উৎপত্তিগতভাবে সম্পর্কীত বেশ কিছু ভাষা পরিবার রয়েছে। বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত ভাষাসমূহ এই সমস্ত ভাষা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। প্রধানত: সাংস্কৃতিক পার্থক্য ও দূরত্বের ফলে ভাষাসমূহ উৎপত্তি ভাষা থেকে ক্রমে ক্রমে স্বকীয়তা বা ভিন্নতা লাভ করেছে। এগুলি ভাষা গোষ্ঠী বলে পরিচিত। বিশ্বে প্রধান প্রায় ৫২ টি বিশ্ব ভাষা পরিবার (Linguistic Family) এবং প্রায় ১০ টি প্রধান ভাষা গোষ্ঠী (Linguistic Groups) রয়েছে।

অনুমান করা হয় যে পৃথিবীতে বর্তমানে প্রায় ২৫০০ থেকে ৩৫০০ ভাষার প্রচলন আছে এবং এর মধ্যে প্রায় ১০০০ ভাষা কেবলমাত্র আফ্রিকা মহাদেশেই ব্যবহৃত হয় (রশীদ, ১৯৮২)। এই ব্যাপক সংখ্যক ভাষা কোন না কোন ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

অঞ্চল	ভাষা পরিবার
এশিয়া ও ইউরোপ	২২
আফ্রিকা	৭
উত্তর আমেরিকা	৮
দক্ষিণ আমেরিকা	১৪
ওশানিয়া	১
মোট	৫২

অর্থাৎ ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ভাষাসমূহ সাধারণত এক ও অভিন্ন ভাষা পরিবার থেকে জন্মলাভ করে ক্রমে ক্রমে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মাধ্যমে স্বতন্ত্র ভাষা রূপে প্রকাশ পেয়েছে।

প্রধান ভাষা গোষ্ঠী: পৃথিবীর ভাষাগোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাজনের প্রধান অন্তরায় সকল ভাষা সম্বন্ধে পর্যাপ্ত তথ্যের অভাব। প্রাপ্ত তথ্যের উপর নির্ভর করে ভাষাবিদগণ পৃথিবীর সকল ভাষাকে ১০টি প্রধান ভাষা গোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। নিম্নে এগুলির তালিকা ও প্রতিটির প্রচলন এলাকা দেখানো হলো (চিত্র ৩.১৪.১)।

সারণী ৩.১৪.১: বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর প্রচলন অঞ্চল

ভাষা গোষ্ঠী	প্রচলন অঞ্চল
১। ইন্দো-ইউরোপীয়	উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ ও রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড,
	দক্ষিণ আফ্রিকা, ইরান, দক্ষিণ এশিয়া।
২। হ্যামিটিক- সোমিটিক	উত্তর ও পূর্ব-উত্তর আফ্রিকা, দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া।
৩। উরাল-আলতাই	উত্তর রাশিয়া, মধ্য এশিয়া, তুরস্ক, হাঙ্গেরী, ফিনল্যান্ড।
৪। নাইজার -কঙ্গো-বান্টু	পশ্চিম, মধ্য ও দক্ষিণ আফ্রিকা।
৫। চীনা-তিব্বতীয়	চীন, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, পূর্ব কাশ্মীর, উত্তর-পূর্ব ভারত।
৬। দ্রাবিড়	দক্ষিণ ভারত, উত্তর শ্রীলঙ্কা।
৭। মালয়-পলিনেশীয়	মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, মালাগাসি।
৮। জাপানী-কোরীয়	জাপান, কোরীয়ান, পেনিনসুলা।
৯। পাপুয়া-অস্ট্রেলিয়া	পাপুয়া-নিউ গিনি, অস্ট্রেলিয়া।
১০। আমেরিন্ডীয়	উত্তর কানাডা, মধ্য আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা।

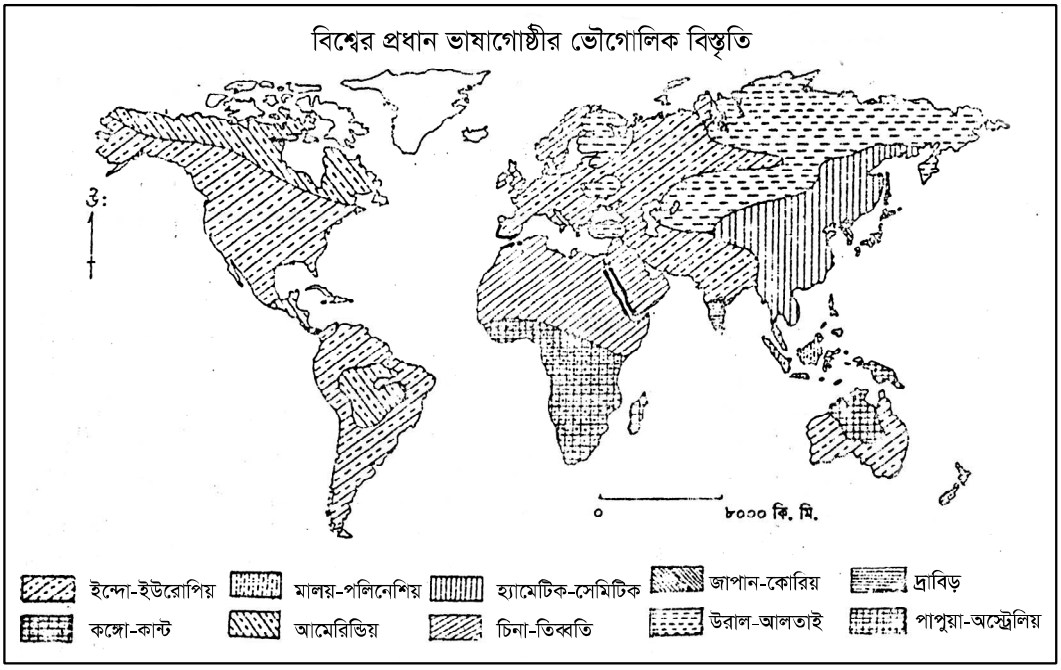

চিত্র ৩.১৪.১: বিশ্বের প্রধান ভাষা গোষ্ঠীর ভৌগলিক বিস্তৃতি

উপরোক্ত প্রতিটির গোষ্ঠীভুক্ত একাধিক ভাষা রয়েছে। রশীদ (১৯৮২) অনুযায়ী এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হলো।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠী: পৃথিবীর সকল ভাষা গোষ্ঠীর মধ্যে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর ভৌগোলিক বিস্তৃতি সর্বাপেক্ষা অধিক। পৃথিবীর সকল মহাদেশেই এই গোষ্ঠীভুক্ত কোন না কোন ভাষার প্রচলন রয়েছে এবং পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক জনসাধারণ এই গোষ্ঠীর কোন এক ভাষায় কথা বলে। ভাষাবিদের মতে প্রাগৈতিহাসিক যুগে পূর্ব-মধ্য ইউরোপে এক প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার অস্তিত্ব ছিল এবং বর্তমান যুগের ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাসমূহ সাধারণ সূত্র থেকে উদ্ভুত রয়েছে। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ভাষা হচ্ছে ইংরেজী, যা যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা,

সারণী: ৩.১৪.১: বিশ্বের শীর্ষ ভাষাসমূহের বিস্তার

ভাষা	জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	ভাষা–ভাষী অঞ্চল
চীনা	১২১৩	চীন, তাইওয়ান।
ইংরেজী	৩২৮	উত্তর আমেরিকা, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড।
হিন্দী	১৮২	ভারত।
স্প্যানিশ	৩২৯	স্পেন, ল্যাটিন আমেরিকা।
রুশ	১৪৪	রাশিয়া।
আরবী	২২১	পশ্চিম এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা।
বাংলা	১৮১	বাংলাদেশ, পূর্ব ভারত (প: বাংলাসহ)
পর্তুগীজ	১৭৮	পর্তুগাল, ব্রাজিল

উৎস : রশীদ ১৯৮২

অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান ভাষা রূপে ব্যবহৃত হয় এবং ব্রিটিশ কমনওয়েলথ দেশসমূহেও এই ভাষার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীকে কয়েকটি উপগোষ্ঠীতে বিভক্ত করা যায়; যথা (১) কেল্টিক (Celtic) : ফরাসী, স্প্যানিশ, পর্তুগীজ ও ইতালীয়, স্কটল্যান্ডের গেইলিক (Gaelic) ও ওয়েলসের ওয়েলশ্ (Welsh); (২) রোমানস (Romance): (৩) জার্মানিক (Germanic): জার্মান, সুইডিশ, নরওয়েজীয়, ডেনীশ, ডাচ ও ইংরেজী; (৪) বাল্টিক (Baltic): ল্যাটভীয় ও লিথুয়েনীয়; (৫) স্লাভিক (Slavic): পূর্ব ইউরোপের চেক, স্লোভাক, সার্বো-ক্রোশীয়, স্লভেনীয়, ম্যাসিডনীয়, পোলিশ, বুলগেরীয় এবং ইউক্রেনীয় ও রুশ; (৭) গ্রীক (Greek); (৮) আলবেনীয় (Albanian); এবং (৯) ইন্দো-ইরানীয় (Indo-Iranian): ফার্সী, পশতু, কুর্দি, বালুচি, হিন্দী, বাংলা, মারাঠি, গুজরাটি, উর্দু, পাঞ্জাবী, সিন্ধি, রাজস্থানী, উড়িয়া, অসমীয়, সিংহলী ইত্যাদি। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে মানবজাতির প্রচলণ ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা সমূহের ব্যাপক বিস্তৃতি ও ক্রমবিবর্ধন ঘটেছে।

হ্যামটিক-সেমিটিক ভাষাগোষ্ঠী: প্রধানত উত্তর আফ্রিকা ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় সীমাবদ্ধ। এ গোষ্ঠীর প্রধান প্রধান ভাষা হচ্ছে আরবী, ইসরাইলের হিব্রু, উত্তর আফ্রিকার বর্বর (Berber), সোমালিয়ার সোমালী এবং ইথিওপিয়ার আমহারিক (Amharic)। উরাল-আলতাই ভাষাগোষ্ঠী ভূতপূর্ব সোভিয়েত ইউনিয়নের সাইবেরিয়া অঞ্চলে উৎপত্তি লাভ করার পর সম্প্রসারণের ফলে পরবর্তীকালে পশ্চিম

ইউরোপের কতিপয় অঞ্চলে প্রসার লাভ করে। উত্তর সাইবেরিয়ার সামোয়েদ (Samoyed), ইয়াকুত (Yakut) ও ল্যাপ (Lapp); ফিনল্যান্ডের ফিনিস (Finish); তুরস্কের তুর্কী: এবং হাঙ্গেরীর মাগীয়ার (Magyar) ভাষা উরাল-আলতাই ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। সাহরার দক্ষিণে প্রচলিত আফ্রিকার অসংখ্য ভাষাকে মূলত: নাইজার কঙ্গো-বাল্ট ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ সকল ভাষা পশ্চিম আফ্রিকা থেকে আফ্রিকার দক্ষিণ সীমান্ত পর্যন্ত প্রচলিত। এই ভাষাগোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য সদস্য হচ্ছে পশ্চিম আফ্রিকার হাউসা (Housa), ইউরুবা (Yoruba). ইবো, ফুলানী, মোসি, অকোন; মধ্য আফ্রিকার মোংগো, পূর্ব আফ্রিকার সোয়াহিলী (Swahili); দক্ষিণ আফ্রিকার শোনো (Shona) ইত্যাদি চীনা, তিব্বতী ভাষাগোষ্ঠী কেবলমাত্র পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সীমাবদ্ধ হলেও বহু লোকের মাতৃভাষা এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। চীনা তিব্বতী ভাষাগোষ্ঠীর প্রধান ভাষা হচ্ছে চীনাভাষা যা গণচীন, তাইওয়ান ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার চীনা সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত। তিব্বতী, বর্মী থাই এবং পূর্ব কাশ্মির ও উত্তর-পূর্ব ভারতের কিছু উপজাতিয় সম্প্রদায়ের ভাষা চীনা তিব্বতী ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

দক্ষিণ এশিয়ায় আর্যদের আগমণের পূর্বে সারা উপমহাদেশে দ্রাবিড় ভাষার প্রচলন ছিল বলে মনে করা হয়। কিছু বর্তমানে দ্রাবিড় ভাষা সমূহের (তামিল, তেলেগু, কানাডা ও মালায়ালাম) প্রচলন কেবল দক্ষিণ ভারতে সীমাবদ্ধ।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালয়-পলিনেশীয় ভাষাগোষ্ঠীতে মালয়েশীয় ইন্দোনেশীয় ও ফিলিপিনো ভাষা উল্লেখযোগ্য। তবে আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলের নিকট অবস্থিত দ্বীপ মালাগাসীর ভাষাও এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং তা প্রাচীনকালে মালাগাসীর সাথে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যোগাযোগের সাক্ষ্য বহন করে। জাপানী ও কোরীয় ভাষাদ্বয়কে এক গোষ্ঠীভুক্ত করা হলেও ঐ দুটি ভাষার মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান আছে। বস্তুতপক্ষে উভয় ভাষাই একটি সম্পূর্ণ পৃথক উপগোষ্ঠীরূপে বিবেচিত হতে পারে।

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার আদিবাসী অর্থাৎ আমেরিকান ইন্ডিয়ানদের বিভিন্ন ভাষাকে শ্রেণীবিভাজনের সুবিধার্থে "আমেরিন্ডীয়" ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ সকল ভাষা উত্তর কানাডা: মধ্য আমেরিকার মেক্সিকো ও গুয়েতেমালা; দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল, গাইয়ানা (Guyana), ভেনেজুয়েলা, কলম্বিয়া, ইকুয়াডোর, পেরু, বলিভিয়া ও চিলির অধিবাসীদের মাতৃভাষা। অনুরূপভাবে, অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের ভাষা এবং পাপুয়া নিউগিনিতে প্রচলিত বিভিন্ন ভাষাকে যুক্তভাবে পাপুয়া অষ্ট্রেলিয়া ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উপরোক্ত প্রধান ভাষাগোষ্ঠীসমূহ ব্যতীত পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র ভাষার প্রচলন দেখা যায়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভাষা হচ্ছে কাম্পুচিয়ার মন্ খমের (Mon khmer); লাওসের লাও; উত্তর-পূর্ব ভারতের উপজাতীয় ভাষা মুন্ডা; ভারত মহাসাগরের আন্দামানী; ভিয়েতনামের ভিয়েতনামী; মধ্য আফ্রিকার সাহারা ও সুদানী; দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার বুশম্যান -হটেনটটদের ভাষা খোইসান (Khoisan); ককেশাস পর্বত এলাকায় প্রচলিত ককেশীয়: স্পেনের উত্তরাঞ্চলের বাস্ক্ এবং উত্তর কানাডা ও গ্রীনল্যান্ডের ইনুইটস।

ভাষা ও রাজনৈতিক সমস্যা

বিশ্বের প্রায় ৩ বিলিয়ন জনসংখ্যা (অর্থাৎ বিশ্বের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যা) ৮ টি ভাষায় কথা বলে। এ গুলি হলো চীনা, ইংরেজী, হিন্দী, স্প্যানিশ, রুশ, আরবী, বাংলা ও পর্তৃগীজ। উল্লেখ্য যে এ গুলিসহ অপরাপর ভাষাসমূহ কোন রাষ্ট্রীয় গন্ডিতে গন্ডিভুক্ত নয়। অপর কথায় রাষ্ট্রীয় বা রাজনৈতিক সীমানা ও ভাষা সীমানা এক নয়। এই বৈশিষ্ট্য বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাতময় পরিবেশ

সৃষ্টি করে থাকে। অপরদিকে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদানের আন্দোলন অনেক দেশেই ঘটেছে।

ভাষা জাতিসত্তার প্রধান উপাদান। স্বাভাবতই রাষ্ট্রীয় সংহতির প্রশ্নে ভাষাগত ঐক্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীর অনেক অঞ্চলে বিশেষ করে ল্যাটিন আমেরিকা, মধ্য আফ্রিকা এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভাষাগত বিভাজন ও জাতিগত সমস্যা রয়েছে। ল্যাটিন আমেরিকার মেক্সিকো, গুয়াতেমালা এবং ব্রাজিলে বহুসংখ্যক লোক শ্রেণীয় ও পর্তুগীজ ছাড়া স্থানীয় আমেরিকীয় ভাষায় কথা বলে। উত্তর আমেরিকার কানাডা একটি দ্বিভাষী রাষ্ট্র, ইংরেজী হচ্ছে প্রধান ভাষা, তবে কুইবেক প্রদেশে অধিকাংশ জনগণ ফরাসী ভাষী বস্তুত : কানাডায় প্রায় ৩০% লোকের মাতৃভাষা ফরাসী। ইথিওপিয়া, সুদান, জায়ারে এবং নাইজেরিয়ার ভাষাগত বিশেষ সমস্যা রয়েছে। ইথিওপিয়াতে কমপক্ষে ৭০টি ভাষা প্রচলিত আছে। নাইজেরিয়ার প্রধান ভাষাগুলি হচ্ছে হাউসা, ইউরোবা, ইবো, ফুলা, এবং এর সাথে ইংরেজীও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় পাকিস্তানে ৪ টি, ভারতে ১৫ টি, শ্রীলংকায় ২টি এবং ইন্দোনেশিয়ার প্রায় ২৫ টি ভাষা প্রচলিত আছে। বহুভাষা সমস্যা ইউরোপ মাহাদেশেও রয়েছে। বেলজিয়াম একটি দ্বিভাষী রাষ্ট্র; উত্তরাঞ্চলের প্রধান ভাষা হচ্ছে ফ্লেমীশ, দক্ষিণের ওয়ালুনগণ (Waloon) ফরাসী ভাষী।এ ছাড়াও সামান্য সংখ্যক জার্মানভাষীও রয়েছে। চেকস্লোভাকিয়াতেও অনুরূপ সমস্যা রয়েছে। এখানে পশ্চিমাঞ্চলের ভাষা হচ্ছে চেক, পূর্বাঞ্চলের প্রধান ভাষা শ্লোভাক। সুইজারল্যান্ড, যুগোশ্লাভিয়া, রুমানিয়া ও রাশিয়াও বহুভাষী জাতি সত্তায় বিভক্ত। ভাষার এ রূপ আভ্যন্তরীণ বিন্যাস বিশ্বে বিভিন্ন জনসংখ্যা কাঠামো বিশেষ করে শিক্ষা, পেশা, অভিগমন প্রভাবিত করছে।

পাঠসংক্ষেপ:

মানব জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভাষা সার্বজনীন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ; কিন্তু ভাষার ব্যাপক বিভিন্নতা রয়েছে। এতদসত্বেও ভাষা জনগোষ্ঠীর একটি প্রধান ও উল্লেখযোগ্য অর্জিত জনমিতিক বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশ জুড়ে উৎপত্তিগতভাবে সম্পর্কীত বেশ কিছু ভাষা পরিবার রয়েছে। পৃথিবীর সকল ভাষা সম্বন্ধে পর্যাপ্ত তথ্যের অভাব ভাষা গোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাজনের প্রধান অন্তরায়। প্রাপ্ত তথ্যের উপর নির্ভর করে ভাষাবিদগণ পৃথিবীর সকল ভাষাকে ১০টি প্রধান ভাষা গোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ভাষার বিভিন্ন আভ্যন্তরীণ বিন্যাস বিশ্বে বিভিন্ন জনসংখ্যা কাঠামো বিশেষ করে শিক্ষা, পেশা, অভিগমনকে প্রভাবিত করছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৩.১৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. শূন্যস্থান পূরণ করুনঃ

১.১. পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশ জুড়ে উৎপত্তিগতভাবে সম্পর্কীত বেশ কিছু ভাষা ------ রয়েছে।

১.২. অনুমান করা হয় যে পৃথিবীতে বর্তমানে প্রায় ------- থেকে ৩৫০০ ভাষার প্রচলন আছে।

১.৩. প্রাপ্ত তথ্যের উপর নির্ভর করে ভাষাবিদগণ পৃথিবীর সকল ভাষাকে ------ প্রধান ভাষা গোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

১.৪. পৃথিবীর সকল ভাষা গোষ্ঠীর মধ্যে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর ------- বিস্তৃতি সর্বাপেক্ষা অধিক।

১.৫. ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে মানবজাতির প্রচলণ ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে ইন্দো------ ভাষা সমূহের ব্যাপক বিস্তৃতি ও ক্রমবিবর্ধন ঘটেছে।

২. সত্য হলে 'স' মিথ্যা হলে 'মি' লিখুনঃ

২.১. হ্যামিটিক-সেমিটিক ভাষাগোষ্ঠী প্রধানত উত্তর আফ্রিকা ও দক্ষিণ-পশ্চিম আমেরিকায় সীমাবদ্ধ।

২.২. তিব্বতী, বর্মী, থাই এবং পূর্ব কাশ্মির ও উত্তর-পূর্ব ভারতের কিছু উপজাতীয় সম্প্রদায়ের ভাষা চীনা তিব্বতী ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

২.৩. বিশ্বের প্রায় ৩ বিলিয়ন জনসংখ্যা (অর্থাৎ বিশ্বের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যা) ১০ টি ভাষায় কথা বলে।

২.৪. দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার পাকিস্তানে ৪ টি, ভারতে ১৫ টি, শ্রীলংকায় ২টি এবং ইন্দোনেশিয়ার প্রায় ২৫ টি ভাষা প্রচলিত।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১. ভাষা পরিবার ও ভাষা গোষ্ঠী কি?

২. বিশ্বে প্রধান ভাষা গোষ্ঠীসমূহ কি কি?

৩. ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর সম্পর্কে ধারণা দিন।

৪. হ্যামিটিক -সেমিটিক ভাষাগোষ্ঠী সম্পর্কে ধারণা দিন।

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. ভাষা পরিবার ও ভাষা গোষ্ঠীর পার্থক্যকরণ করুন।

২. বিশ্বের প্রধান ভাষা গোষ্ঠীসমূহ আলোচনা করুন।

৩. ভাষার সাথে রাজনীতির সম্পর্ক সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

পাঠ-৩.১৫ জনসংখ্যা কাঠামো : ধর্ম

এই পাঠ শেষে আপনি-

- জনসংখ্যা কাঠামোর অন্তর্গত ধর্ম;
- ধর্মের বিশ্ব বন্টন সম্পর্কে ধারনা লাভ করবেন।

ধর্ম জনসংখ্যার একটি প্রধান অর্জিত কাঠামোগত উপাদান। বিশ্বব্যাপী ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত সাংস্কতিক বৈচিত্রের প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। জনমিতিক প্রক্রিয়াও ধর্মের বিশেষ এবং অনেক সময় সরাসরি ভূমিকা রয়েছে। ধর্মীয় বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান, বিবাহ প্রথা জনসংখ্যার বৈবাহিক কাঠামো ও জন্ম হারকে প্রভাবিত করে। গোড়া মুসলিম ও খৃষ্টান ক্যাথলিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণের অনুমোদন নেই। একইভাবে গোড়া খ্রীষ্টান ও ইহুদী সম্প্রদায়, যেমন যুক্তরাষ্ট্রের ডাকোটা, মান্টানাও সংলগ্ন কানাডায় বসবাসরত মেনোনাইট, হুটেরাইট এবং ইসরাইলের ব্যাপক ইহুদী জনগোষ্ঠীর মধ্যে ও প্রায় সমগ্র আরব বিশ্বে বাল্য বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে এবং এই সমস্ত ধর্মীয় গোষ্ঠী পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থাকে পাপাচার মনে করে থাকে। এই ধরণের জনগোষ্ঠীতে উচ্চ জন্ম হার এবং বৃহৎ আকারের পরিবার দেখা যায়।

অতীতে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে শিশু হত্যা (Infanticide); বিশেষ করে নারী শিশু হত্যার প্রচলন ছিল। ভারতে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের এই প্রথা বহুল প্রচলিত ছিল। বৃটিশ সরকারের সংস্কারমূলক দৃঢ় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং হিন্দু নেতাদের প্রচেষ্টায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এই প্রথার অবসান ঘটে। ধর্মীয় বিশ্বাস ও সামাজিক রীতি হিসাবে খৃষ্টান ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কিছু সম্প্রদায়ের মধ্যে নারী বা পুরুষ উদারপন্থী কৌমার্য (Celibacy) প্রথার প্রচলনও উল্লেখযোগ্য। প্রজননশীলতার উপর উভয় প্রথার নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে। ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পৃথিবীর জনসংখ্যা বহুধা বিভক্ত। সমগ্র বিশ্বে বিভিন্ন সূত্রে প্রকৃত অনুশীলিত ধর্মাবলম্বীদের মোটামুটি সংখ্যা পাওয়া যায় (সারণী ৩.১৫.১)। এদের সাধারণ বিশ্ব বিন্যাস চিত্র ৩.১৫.১-এ দেখা যেতে পারে।

ধর্মের বিশ্ব বন্টন

পারিসরিক বিস্তৃতি অনুযায়ী বর্তমান বিশ্বে সর্বাধিক পরিব্যাপ্ত ধর্ম হচ্ছে খৃষ্টান ধর্ম এবং সকল প্রকার খৃষ্ট ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা প্রায় ১৮৭০ মিলিয়ন (সারণী ৩.১৫.১)। ইউরোপ, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের জনগণ খ্রীষ্টান। এ ছাড়াও আফ্রিকার ইথিওপিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র এবং এশিয়ার ফিলিপাইনের জনগণ খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ভুক্ত।

সারণী ৩.১৫.১: বিশ্বের শীর্ষ ধর্মসমূহ, ২০১০

ধর্ম	অনুসারী সংখ্যা (মিলিয়ন)
মুসলিম	১৫০০
খ্রীষ্টান	২১০০
হিন্দু	৯০০
সর্ব প্রাণবাদী	৯১০
বৌদ্ধ	৩৭৬
চীনা লোক ধর্ম	৩৯৪
শিখ	২৩
ইহুদি	১৯
জৈন	৪.২
শিন্টো	৪
নব্য ধর্মাবলম্বী	১

উৎস : The World Almonac and Book Facts, 2010

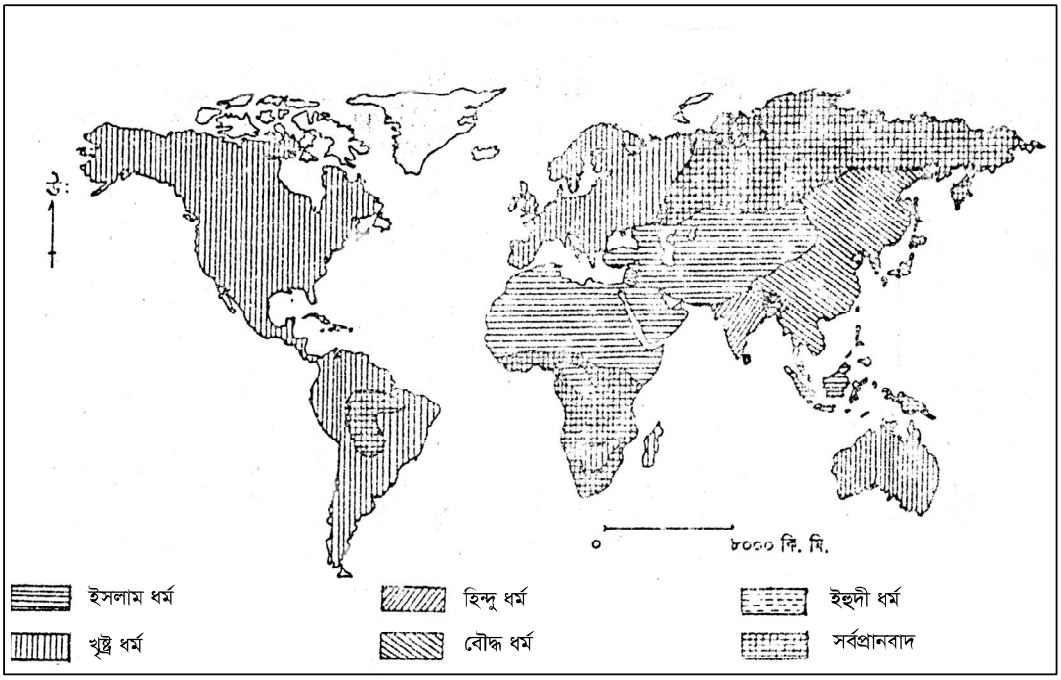

উৎস: রশীদ, কে.বি.এস. ১৯৯২। সাংস্কৃতিক ভূগোল, ঢাকা বাংলা একাডেমী।

চিত্র : ৩.১৫.১: বিশ্বের প্রধান ধর্মাবলম্বীদের ভৌগোলিক বিস্তৃতি।

উল্লেখ্য খ্রীষ্টানধর্ম অন্যান্য কতিপয় ধর্মের মত বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত এবং এর প্রধান দুটি শ্রেণী হচ্ছে ক্যাথলিক ও প্রটেষ্ট্যান্ট। দক্ষিণ ইউরোপ, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং ফিলিপাইনের জনগণ ক্যাথলিক খ্রীষ্টান; উত্তর ইউরোপ, পশ্চিম ইউরোপের অংশবিশেষ, উত্তর আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকায় প্রটেষ্টান্ট খ্রীষ্টানগণ সংখ্যাগুরু। ইথিওপিয়ার খ্রীষ্টানগণ কপটিক (Coptic) শ্রেণীভুক্ত (তাহা, ১৯৮৯)। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্বে রাশিয়ায় পূর্বাঞ্চলীয় সনাতন খ্রীষ্টান ধর্মের (Eastern Orthodox) বিশেষ প্রাধান্য ছিল; বর্তমানে এর সামান্যই প্রভাব রয়েছে।

আঞ্চলিক বিস্তৃতির ক্ষেত্রে পৃথিবীর দ্বিতীয় প্রধান ধর্ম হচ্ছে ইসলাম। উত্তর আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়া এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, মালদ্বীপ, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায় মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ট। ইউরোপে আলবেনিয়া হচ্ছে একমাত্র মুসলমান প্রধান রাষ্ট্র। এ ছাড়া যুগোস্লাভিয়া ও বুলগেরিয়ায় কিছু মুসলমান রয়েছে। এতদ্বব্যতীত আফ্রিকার পশ্চিম ও পূর্বের কতিপয় অঞ্চল, দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তমাশা আন্তরীপের একটি অংশ, মধ্য এশিয়ায়, ভারত, শ্রীলংকা ও ফিলিফাইনের দক্ষিণ মিন্ডানাও (Northern Mindanao) অঞ্চলে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও বহু সংখ্যক মুসলমান রয়েছে। সমগ্র পৃথিবীতে বর্তমানে মুসলমানদের সংখ্যা ১৫০০ মিলিয়ন। উল্লেখ্য ইরানের মুসলমানগণ শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত, পার্শ্ববর্তী কতিপয় অঞ্চলেও শিয়া মুসলমান রয়েছে। অন্যান্য অঞ্চলের মুসলমানগন প্রধানত: সুন্নী। এ ছাড়াও খ্রীষ্টান ধর্মের মত ইসলাম ধর্মেও একাধিক শ্রেণীবিভাগ রয়েছে। তৃতীয় প্রধান ধর্ম হচ্ছে এ্যানিমিষ্ট বা সর্বপ্রাণবাদী। এর অনুসারী সংখ্যা প্রায় ৯১০ মিলিয়ন। প্রধানত: বৌদ্ধ, শিন্টো, জৈন এবং পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বেশ কিছু ধর্মের সংমিশ্রণে এ ধর্মের উৎপত্তি। চীন, জাপান, কোরিয়া, ভিয়েতনাম, লাওস, মঙ্গোলীয়া এবং তাইওয়ানে এই ধর্মের ব্যাপক অনুসারী রয়েছে।

পৃথিবীর চতুর্থ প্রধান ধর্ম হচ্ছে হিন্দু। ২০১০ সালে সমগ্র পৃথিবীতে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৯০০ মিলিয়ন। ভারতের অধিকাংশ জনগণ হিন্দু ধর্মাবলম্বী। এছাড়া নেপাল, বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, ফিজি, গায়ানা, ত্রিনিদাদ ও টোবাগো প্রভৃতি দেশেও সামান্য সংখ্যক হিন্দু রয়েছে।

পৃথিবীর পঞ্চম প্রধান ধর্ম হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্ম। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শ্রীলংকা, বার্মা, থাইল্যান্ড, লাওস, চীন, জাপান, কাম্পুচিয়া, ভিয়েতনাম, কোরিয়া, প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। সমগ্র বিশ্বে বৌদ্ধদের সংখ্যা প্রায় ৩৭৬ মিলিয়ন। জাপানের শিন্টো (Shinto) ধর্মকে বৌদ্ধ ধর্মেরই একটি শ্রেণী হিসাবে অভিহিত করা হয়ে যাকে (তাহা, ১৯৮৯)। এ ছাড়া চীন ও জাপানে রয়েছে কনফুসীয় (Confucian) এবং টাও ধর্মীগণ; কনফুসীয় ও টাও মতাদর্শের ইহলৌকিক ভাবধারার সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের যথেষ্ট মিল রয়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ইহুদী ধর্ম (Judaism), শিখধর্ম, জৈনধর্ম, জোরোরাষ্ট্রীয় (Zoroastrian, Zarathustra) বা পারসিক ধর্ম। ইহুদিগণ ইসরাইলে সংখ্যাগরিষ্ঠ। ইসরাইল ছাড়াও ইউরোপ, রাশিয়া, সোভিয়েট ইউনিয়নে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং উত্তর পশ্চিম আফ্রিকায়ও সামান্য সংখ্যক ইহুদি ধর্মাবলম্বী রয়েছে। সমগ্রবিশ্বে ইহুদিদের সংখ্যা প্রায় ১৮ মিলিয়ন। শিখ ও জৈনগণ প্রধানত: ভারতের অধিবাসী। ভারতে আনুমানিক প্রায় ২৩ মিলিয়ন শিখ এবং ৪.২ মিলিয়ন জৈন রয়েছে। পারসিক ধর্ম প্রাচীন ইরানের ধর্ম। ইরান ও ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে কিছুসংখ্যক পারসিক রয়েছে। এতদ্বব্যতীত পৃথিবীর অনুন্নত দুর্গম পার্বত্য অঞ্চল সমূহে বহু উপজাতীয় ধর্ম রয়েছে; এবং ইউরোপ, রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনেক নাস্তিক লোক রয়েছে (তাহা, ১৯৮৯)।

পাঠসংক্ষেপ:

ধর্ম জনসংখ্যার একটি প্রধান অর্জিত কাঠামোগত উপাদান। বিশ্বব্যাপী ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত সাংস্কৃতিক বৈচিত্রের প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। জনমিতিক প্রক্রিয়াও ধর্মের বিশেষ এবং অনেক সময় সরাসরি ভূমিকা রয়েছে।

পারিসরিক বিস্তৃতি অনুযায়ী বর্তমান বিশ্বে সর্বাধিক পরিব্যাপ্ত ধর্ম হচ্ছে খৃষ্টান ধর্ম এবং সকল প্রকার খৃষ্ট ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা প্রায় ১৮৭০ মিলিয়ন (সারণী ৪.৪.৫)। ইউরোপ, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের জনগণ খ্রীষ্টান। এ ছাড়াও আফ্রিকার ইথিওপিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র এবং এশিয়ার ফিলিফাইনের জনগণ খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ভুক্ত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ৩.১৫

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন:

১. শূন্যস্থান পূরণ করুন:

১.১. ধর্ম জনসংখ্যার একটি প্রধান অর্জিত কাঠামোগত -------।

১.২. পারিসরিক বিস্তৃতি অনুযায়ী বর্তমান বিশ্বে সর্বাধিক পরিব্যাপ্ত ধর্ম হচ্ছে ------- ধর্ম।

১.৩. খ্রীষ্টানধর্ম অন্যান্য কতিপয় ধর্মের মত বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত এবং এর প্রধান দুটি শ্রেণী হচ্ছে ক্যাথলিক ও -------।

১.৪. আঞ্চলিক বিস্তৃতির ক্ষেত্রে পৃথিবীর দ্বিতীয় প্রধান ধর্ম হচ্ছে -------।

১.৫. ------- প্রধান ধর্ম হচ্ছে এ্যানিমিষ্ট বা সর্বপ্রাণবাদী।

১.৬. পৃথিবীর ------- প্রধান ধর্ম হচ্ছে হিন্দু।

১.৭. পৃথিবীর ------- প্রধান ধর্ম হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্ম।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১. খ্রীষ্টান ধর্মের বিশ্ব বন্টন কি?

২. ইসলাম ধর্মের বিশ্ব বন্টন কি?

৩. পৃথিবীর প্রধান পাঁচটি ধর্ম কি কি?

রচনামূলক প্রশ্ন:

১. জনসংখ্যার ধর্মীয় কাঠামো বলতে কি বুঝ? বিশ্বের প্রধান ধর্মাবলম্বীদের বণ্টন আলোচনা কর।

পাঠ-৩.১৬ জনসংখ্যা পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন

এই পাঠ শেষে আপনি-

- জনসংখ্যা পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন;
- বিংশ শতাব্দীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পর্যালোচনা;
- জনসংখ্যা পরিবর্তনের সাম্প্রতিক ধারা; এবং
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ধারনা লাভ করবেন।

এই ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে আমরা দেখেছি যে, প্রজননশীলতা, মরণশীলতা, এবং অভিগমনের জনমিতিক প্রক্রিয়া একটি জনসংখ্যা বা দেশের জৈবিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, ভৌগোলিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই সমস্ত উপাদান বা নিয়ামক জনমিতিক প্রক্রিয়াকে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে। এ ধরণের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কারণে বিশ্ব জনসংখ্যা বিশেষ আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। ফলে বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে প্রায় ২ বিলিয়ন জনসংখ্যা শতাব্দীর শেষে ৬ বিলিয়নে দাঁড়িয়েছে। ১৯৮৮ থেকে ১৯৯৯ সালের মধ্যে ১ বিলিয়ন জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে। বিশ্ব জনসংখ্যা আরো ১ বিলিয়ন কত দ্রুত বৃদ্ধি পাবে তা নির্ভর করবে বর্তমান দশকের জনসংখ্যা পরিকল্পনা সংক্রান্ত নীতি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অর্থাৎ এ সম্পর্কে গৃহীত ব্যবস্থার উপর।

উপরোক্তের পরিপেক্ষিতে এই পাঠে আমরা জনসংখ্যা পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন প্রচেষ্টার প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত বিষয়াদির উপর আলোকপাত করবো:

- বিংশ শতাব্দীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পর্যালোচনা;

- জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রক্রিয়া; এবং

- জনসংখ্যা ও উন্নয়ন: বিশ্ব কৌশল অনুসন্ধান।

উপরোক্ত তিনটি বিষয় অনুধাবনের জন্য আমরা প্রধানত: জাতিসংঘ প্রকাশিত তথ্যাদি ব্যবহার করবো।

বিংশ শতাব্দীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি : একটি পর্যালোচনা

এই শতকে বিশ্ব জনসংখ্যা ৪ গুন বেড়েছে; ইতিহাসের যে কোন সময়ের চেয়ে এই বৃদ্ধি দ্রুততম। ২০ শতকের গোড়ার দিকে বিশ্বের জনসংখ্যা ছিল প্রায় ১.৫ বিলিয়ন। ১৯২৭ সালে ইহা পৌছায় ২ বিলিয়নে, তারপর ১৯৬০ সালে ৩ বিলিয়নে, ১৯৭৪ সালে ৪ বিলিয়ন, ১৯৯৯ সালে ৬ বিলিয়ন এবং ২০১০ সালে ৬.৯ বিলিয়নে পৌছে। (সারণী ৩.১৬.১) এবং চিত্র ৩.১৬.১।

সারণী: ৩.১৬.১ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের জনসংখ্যা বৃদ্ধি ১৭০০-২০০০

অঞ্চল	জনসংখ্যা (মিলিয়ন)					শতকরা হার				
	১৭০০	১৮০০	১৯০০	১৯৫০	২০০০	১৭০০	১৮০০	১৯০০	১৯৫০	২০০০
বিশ্ব	৭৯১	৯৭৮	১৬৫০	২৫২১	৬০৫৫	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০
উন্নত বিশ্ব	১৯১	২৩৬	৫৩৯	৮১৩	১১৮৮	২৪	২৪	৩৩	৩২	২০
উত্তর আমেরিকা	২	৭	৮২	১৭২	৩১০	-	১	৫	৭	৫
ইউরোপ	১৬৩	২০৩	৪০৮	৫৪৭	৭২৯	২১	২১	২৫	২২	১২
ওশানিয়া	২৬	২৬	৪৯	৯৫	১৪৯	৩	৩	৩	৪	২
বিকাশশীল বিশ্ব	৬০০	৭৪২	১১১১	১৭০৯	৪৮৬৭	৭৬	৭৬	৬৭	৬৮	৮০
আফ্রিকা	১০৬	১০৭	১৩৩	২২১	৭৮৪	১৩	১১	৮	৯	১৩
এশিয়া	৪৭৮	৬১১	৯০৪	১৩২১	৩৫৬৩	৬০	৬২	৫৫	৫২	৫৯
ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান	১৬	২৪	৭৪	১৬৭	৫১৯	২	২	৪	৭	৯

উৎস : PRB: 2000. Population Buletion, 54(1), Washingtion, D.C:PRB.

আজকের দিনে মানুষ অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় দীর্ঘ ও স্বাস্থ্যকর জীবন লাভ করেছে। আধুনিক চিকিৎসা এবং জীবন যাত্রার উচ্চ মান বিশ্ব জুড়ে মৃত্যুর, বিশেষ করে শিশু ও নবজাতক মৃত্যুর হার নাটকীয়ভাবে কমিয়ে দিয়েছে। ১৯৫০ সালের পর থেকে গড় আয়ু ৪৬ থেকে বেড়ে ৬৬ হয়েছে। ছেলেমেয়ের সংখ্যা এবং সন্তানের মাঝে বিরতি দেয়ার ব্যাপারে নিজের পছন্দ কার্যকর করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপকরণ অধিক সংখ্যক নারী ও পুরুষের হাতে পৌঁছে যাচ্ছে। কিন্তু সব কিছুর পরও এখনও ১০০ কোটি মানুষ প্রতি ৬ জন থেকে ১ জন দারিদ্রের মধ্যে বসবাস করছে।

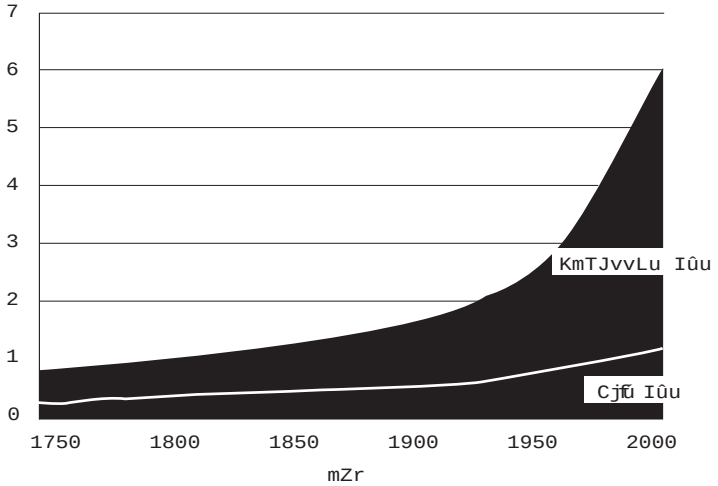

চিত্র ৩.১৬.১: উন্নত ও বিকাশশীল অঞ্চলের জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ১৭৫০-২০০০ (UNO.1998)

জন্ম হার কমার কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমলেও মানুষের প্রকৃত বৃদ্ধির সংখ্যা এখনো ঐতিহাসিক সর্বোচ্চ পর্যায়ের কাছাকাছি ৬.৯ বিলিয়ন। এর কারণ হচ্ছে সন্তান উৎপাদনক্ষম নারীও পুরুষের সংখ্যা এখন অনেক। জনসংখ্যা সবচাইতে বেশী বাড়ছে সাহারা সংলগ্ন আফ্রিকায়। এখানে নারীপিছু সন্তান সংখ্যা ৫.৫। অন্যদিকে ইউরোপ উত্তর আমেরিকা ও জাপানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি কমে গেছে বা প্রায় থেমে গেছে। শিল্পোন্নত দেশেগুলোর মধ্যে একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রে এখনও ব্যাপক জনসংখ্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে সেই বৃদ্ধির অধিকাংশই অভিগমনের ফল।

জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক দপ্তরের হিসাব অনুযায়ী বিশ্ব জনসংখ্যা ২০১০ সালে ৬.৯ বিলিয়ন থেকে ২০৫০ সালের মধ্যে ১০.৭ বিলিয়নের মধ্যে কোন এক স্থানে পৌঁছাবে। এর অর্থ বিশ্ব জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বিগত ৫০ বছরের মতো আগামী ৫০ বছরও অব্যাহত থাকবে। এ অবস্থায় এখনকার বার্ষিক ৭০.৮ মিলিয়ন বৃদ্ধি পর্যায়ক্রমে ২০২০-৫০ সাল নাগাদ ৬০.৪ মিলিয়নে নেমে আসবে। তারপর ২০৪৫-৫০ সাল নাগাদ ৩.৩ বিলিয়ন দাঁড়াবে (UNO.1999) চিত্র ৩.১৬.২।

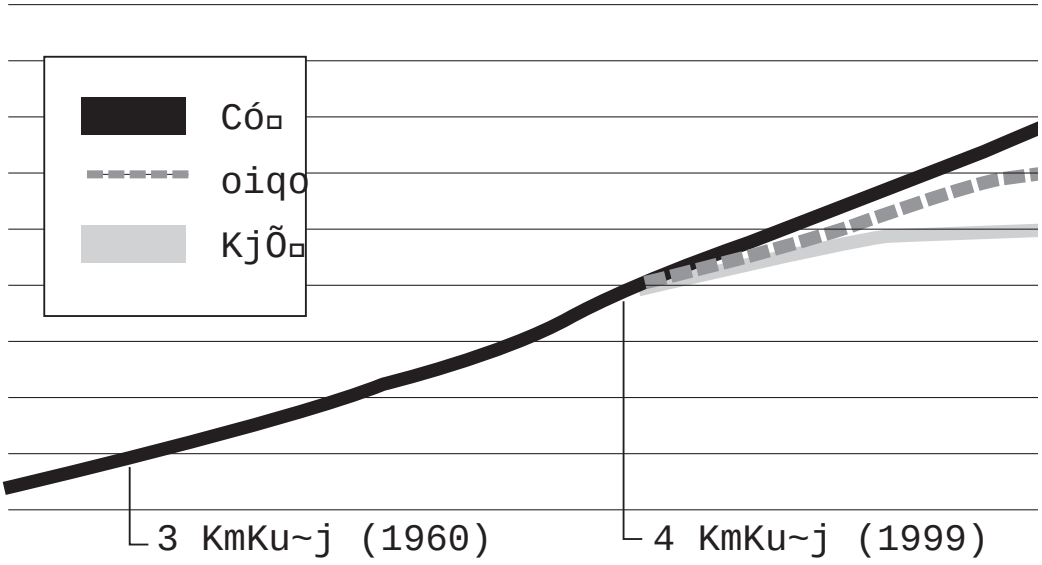

চিত্র ৩.১৬.২: বিশ্ব জনসংখ্যা বৃদ্ধি: প্রকৃত এবং প্রাক্কলিত, ১৯৫০-২০৫০।

(সূত্র: UNO, 1999)।

জনসংখ্যা পরিবর্তনের সাম্প্রতিক ধারা

স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি এবং পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থা সহজলভ্য হওয়ার কারণে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার নারীরা এখন কম সংখ্যক সন্তানের মা হচ্ছেন এবং পরিবারের আকার অতীতের যে কোন সময়ের চাইতে ছোট হচ্ছে। ১৯৬৯ সালে জাতিসংঘের জনসংখ্যা তহবিল (UNFPA) গঠনের পর থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সামগ্রিক জন্ম হার অর্ধেকে নেমে এসেছে, নারীপিছু সন্তান গতি কমে এসেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সর্বোচ্চ হার তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলোতে যারা ক্রমবর্ধমান তরুণ জনগোষ্ঠীর জন্য মৌলিক সেবার ব্যবস্থা এবং কর্মসংস্থানের জন্য আদৌ তৈরী নয়। এ রকম দেশ দক্ষিণ এশিয়া ও আফ্রিকাতেই বেশী তবে, প্রতিটি বিকাশশীল অঞ্চলেই একটি বা দুটি আছে। আফ্রিকা এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকার ৬২ টি দেশের ৪০ শতাংশের বেশী মানুষের বয়স

১৫ এর নীচে। আফ্রিকা একই সঙ্গে দ্রুততম জনসংখ্যা বৃদ্ধির অঞ্চল এবং একই সঙ্গে বয়সের বিন্যাসে কনিষ্ঠতমও। আফ্রিকানদের গড় বয়স এখন ১৮। সারা বিশ্বে ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সীর সংখ্যা ১ বিলিয়নেরও বেশী, যারা আগামী প্রজন্মের বাবা-মা।

একই সময় দেখা যাচ্ছে, ৬১টি দেশে জন্ম হার প্রতিস্থাপন স্তরের সমান বা কম। একটা দীর্ঘ সময় পর তাদের জনসংখ্যা কমে যেতে পারে। নিম্ন জন্মহারের দেশের সংখ্যা বাড়তে থাকায় এই প্রবণতা মোট যত সংখ্যক দেশে দেখা যাচ্ছে বিশ্ব জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের বাস। অবশ্য বিশ্বের কোথাও এখনও জন্ম হার প্রতিস্থাপন স্তরে নামার তেমন কোনো লক্ষণ দেখা দেয়নি। বছরে ১ বিলিয়ন হারে শিশু জন্ম আগামী আরো ৫০ বছর ধরে চলতে থাকবে। আর বৃদ্ধদের সংখ্যাও বাড়তে থাকায় মৃত্যু হারও উচ্চ থাকবে। এই অবস্থা এখনই শিল্পোন্নত দেশগুলোতে শুরু হয়েছে। বিশ্বে এখন বৃদ্ধের সংখ্যা অতীতের যে কোন সময়ের চাইতে বেশী। ইউএনএফপি এর প্রতিবেদনে জনসংখ্যার এই পরিবর্তন উল্লেখ করে এ ব্যাপারে নীতিমালা পরিবর্তনেরও আহবান জানিয়েছে। বিশ্বজুড়ে বিশেষত উন্নত দেশগুলো বৃদ্ধ হতে থাকা জনসংখ্যার জন্য অর্থনৈতিক সহায়তা এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যা নিশ্চিত করার এক চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছে। তুলনামূলক ভাবে কম সংখ্যক তরুণ নিয়ে তারা এখন বৃদ্ধদের মধ্যেই কর্মক্ষম মানুষ খুঁজছে এবং কর্মশক্তির অর্থনৈতিক প্রয়োজনে অভিবাসনকারীদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। যে সব দেশে এখন জন্ম হার বেশী তারা যদি কর্মক্ষম প্রজন্মের জন্য পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান করতে পারে, তাহলে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উন্নয়নের একটি সুযোগ সামনের দিন গুলোতে পাবে।

বিশেষজ্ঞরা যে রকম অনুমান করেছিলেন এইচ আইভি এইডস তার চাইতেও ভয়াবহ প্রভাব বিস্তার করছে। অবস্থা সবচাইতে খারাপ সাহারা সংলগ্ন আফ্রিকায়। এ অঞ্চলে মৃত্যুর সব চাইতে বড় কারণ হচ্ছে এইডস। শিশু মৃত্যু হার হ্রাস এবং গড় আয়ু বাড়ার ফলে যে অগ্রগতি হয়েছিল তা ধ্বংস করে ফেলার উপক্রম করেছে এই রোগটি। আফ্রিকার ২৯টি দেশে বর্তমান গড় আয়ু এইডস বিহীন অবস্থার যা হতে পারতো তার চেয়ে ৭ বছর কম। অবশ্য উচ্চ জন্মহারের কারণে ঐ সব দেশের জনসংখ্যা কমে যাওয়ার আশঙ্কা নেই।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রতিক্রিয়া

ভারসাম্যহীন ভোগ বিন্যাস এবং ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বিশেষ করে শহরাঞ্চলে পানি ও জমি সম্পদের ওপর প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করেছে। শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে দেখা যাচ্ছে বিশ্বের ধনীতম এক পঞ্চমাংশ মানুষ, দরিদ্রতম এক-পঞ্চমাংশের তুলনায় ৬৬ গুন বেশী সম্পদ ও পণ্য ভোগ করেছে। বর্ধিত জনসংখ্যা ইতিমধ্যেই মাথাপিছু জমির পরিমাণ ১৯৫০ এর তুলনায় অর্ধেক নামিয়ে এনেছে। বিশ্বের মাথাপিছু খাদ্যশস্য উৎপাদন গত এক দশক ধরে স্থির রয়েছে। পানি সংকট আর একটি বড় উদ্বেগের কারণ। সাম্প্রতিক এক জরিপে আশংকা প্রকাশ করা হয়েছে যে ২০৫০ সাল নাগাদ পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশ মানুষ এমন সব দেশে বসবাস করবে, যেসব দেশে অব্যাহত পানি সঙ্কট লেগেই আছে অথবা বরাবর সঙ্কটের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে।

জনসংখ্যার এই ক্রমবৃদ্ধি এবং ভারসাম্যহীন ভোগ সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাওয়া, বন উজাড় হওয়া, তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং অন্যান্য গাছপালা ও পশুপাখি বিলুপ্তির মত পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে একুশ শতকে আমাদের প্রকৃতই এই সিদ্ধান্তের মুখোমুখি হতে হবে যে, বর্ধিত মানুষের জায়গা করে দিতে আমরা আর কত উদ্ভিদ, জীব প্রজাতি এবং পরিবেশের ভারসাম্যকে ধ্বংস করব। অব্যাহত নগরায়ন এবং আন্তজার্তিক অভিগমন এ সংক্রান্ত নীতিমালা

সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সামনে নিয়ে এসেছে। এখন বিশ্বের প্রায় অর্ধেক মানুষ শহরাঞ্চলে বাস করে। ১৯৬০ সালে এই সংখ্যা ছিল বিশ্বের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক। বিশ্বব্যাপী প্রতি বছর শহরবাসীর সংখ্যা ৬ মিলিয়ন হারে বাড়ছে। অনুমান করা হচ্ছে ২০৩০ সাল নাগাদ বিশ্বের প্রায় ৬০ শতাংশ মানুষ অর্থাৎ ৫ বিলিয়ন হবে শহরাঞ্চলের বাসিন্দা। যাদের বেশীর ভাগেরই বাস হবে মেগাসিটিতে যে গুলোর লোকসংখ্যা ১ মিলিয়নের উর্দ্ধে। আজকের দিনে মেগা সিটির সংখ্যা ২৪ টি, ১৯৬০ সালে এ সংখ্যা ছিল মাত্র ২ টি আর ২০১৫ সাল নাগাদ বাড়তে পারে ২৬ টিতে, যার মধ্যে ২২টিই হবে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে। এদের ১৮ টি হবে এশিয়ায়। ১৯৯৪ সালে কায়রোতে অনুষ্ঠিত জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ক আন্তজার্তিক সম্মেলনে ২০ বছর মেয়াদি যে কর্ম পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল তা বাস্তবায়নে তহবিল সংকট রয়েছে। প্রজনন স্বাস্থ্য সেবায় আরো তহবিল সংস্থানের প্রয়োজন রয়েছে। ইউএনএফপি-এর প্রতিবেদনে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে, সরকারগুলো যদি আরো পদক্ষেপ এবং তহবিল সংস্থানের উদ্যোগ না নেয়, তাহলে অব্যাহত দারিদ্র্য, লিঙ্গ বৈষম্য, এইডসের মত নতুন হুমকি পরিবেশ বদলে যাওয়া এবং উন্নয়ন ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্পদ কমে যাওয়ার মত পরিস্থিতি নিম্ন জন্মহারের কারণে অর্জিত অগ্রগতিকে নস্যাৎ করে দিতে পারে।

জনসংখ্যা ও উন্নয়ন: বিশ্ব কৌশল অনুসন্ধান

জনসংখ্যা বৃদ্ধির বেশীর ভাগই ঘটছে বিশ্বের দরিদ্রতম ও স্বল্প উন্নত দেশগুলোতে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি ধীর রাখা হবে কি না তারা ক্রমশ: ভালো সময়ের দিকে নাকি কঠিন সময়ের দিকে এগোবে, এসবই নির্ভর করছে আগামী দশকে বিশেষত শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি, লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠা এবং প্রজনন স্বাস্থ্যসহ সামগ্রীক স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিত করতে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়, তার উপর। জনসংখ্যা সবচাইতে বেশী হারে বাড়ছে সাহারা সংলগ্ন আফ্রিকায় এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়ার কিছু অংশে। আর এই দিকে ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা ও জাপানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি কমে গেছে বা প্রায় থেমে গেছে। শিল্পোন্নত দেশ গুলোর মধ্যে একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রে এখনো ব্যাপক জনসংখ্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে সেই বৃদ্ধির বেশীর ভাগই অভিগমনের ফলে।

আমরা এমন এক অবস্থা নিয়ে ২১ শতকে প্রবেশ করছি, যাতে এখনো বিশ্বের ৪.৮ বিলিয়ন মানুষের তিন-পঞ্চমাংশই মৌলিক পরিচ্ছন্নতা থেকে বঞ্চিত। প্রায় এক-তৃতীয়াংশই নিরাপদ পানি পায় না। এক চতুর্থাংশেরই উপযুক্ত বাসগৃহ নেই আর আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত প্রায় এক-পঞ্চমাংশ মানুষ। স্বল্পোন্নত অঞ্চলের এক-পঞ্চমাংশ শিশু স্কুলে যেতে পারে না।

অপচয়ী ও ভারসাম্যহীন ভোগ এবং ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাবার ও পানির চাহিদা এই বসুন্ধরাকে বর্ধিত চাপের মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। এর সঙ্গে রয়েছে উষ্ণতা বৃদ্ধির কুফল। উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং ঘন ঘন ঝড় ও বন্যা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের জীবনযাত্রায় প্রভাব ফেলবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমায় যে সুফল পাওয়ার কথা ছিল দারিদ্র্য, লিঙ্গ বৈষম্য, এইডস, উন্নয়নের জন্য সম্পদের সীমাবদ্ধতা প্রভৃতির সমষ্ঠিগত প্রভাব, সেটাকে নষ্ট করে দেয়ার উপক্রম করেছে।

কায়রোর মতৈক্য

সৌভাগ্যের বিষয় হচ্ছে করণীয় সম্পর্কে বিশ্বে একটি মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৯৪ সালে কায়রোতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক জনসংখ্যা ও উন্নয়ন সম্মেলনে উপস্থিত ১৭৯টি দেশ একমত হয়েছিল যে, উন্নয়ন ও জনসংখ্যা অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। তারা এ নিয়েও মতৈক্যে পৌঁছেছিল যে নারীর ক্ষমতায়ন এবং শিক্ষা ও প্রজনন স্বাস্থ্য সহ মানুষের স্বাস্থ্য সেবার চাহিদা মেটানো, ব্যক্তির বিকাশ ও সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। লিঙ্গগত সমতা প্রতিষ্ঠা, নারীর প্রতি সহিংসতা নির্মূল এবং তার প্রজনন ক্ষমতার উপর তার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাই হলো জনসংখ্যা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতিমালার মৌলিক বিষয়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সার্বজনীন শিক্ষা ও পরিবার পরিকল্পনাসহ প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা ও সাধারণ স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা এবং নবজাতক, শিশু ও মাতৃ মৃত্যুর হার কমানো।

কায়রো সম্মেলনের পর থেকে এ পর্যন্ত এ সব বিষয়ের অগ্রগতি পর্যালোচনায় দেখা যায় আইসিপিডির এজেন্ডাগুলো বাস্তবভিত্তিক এবং বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও এগুলো বাস্তবায়িত হচ্ছে। অগ্রগতি পর্যালোচনা প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে বস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের উদ্যেগের উপর প্রতিবেদন বিশ্বজুড়ে বিশেজ্ঞদের বৈঠক এবং হেগে ইউএনএফপিএ আয়োজিত একটি আন্তজার্তিক ফোরাম। এ সবের সূত্র ধরে আরো অগ্রগতির জন্য করণীয় নির্ধারণে সবশেষে ১৯৯৯ এর ৩০জুন থেকে ২ জুলাই পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের বিশেষ অধিবেশন।

দারিদ্র দূরীকরণ, মৌলিক ও সামাজিক প্রয়োজনগুলো মেটানো, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, সম্পদ ও বনাঞ্চল সংরক্ষণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে পরিকল্পনা নির্ধারণে কতগুলো জনতাত্ত্বিক উপাদান যেমন -কম বয়সী ও বৃদ্ধ বয়সীদের নজির বিহীন সংখ্যা নগরায়ন এবং আন্তজার্তিক অভিগমন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অহিসিপিডির পর গত ৫ বছরে অনেক দেশই জনসংখ্যা সংক্রান্ত বিষয়গুলো সন্নিবেশিত করে নতুন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। প্রায় অর্ধেক দেশ তাদের জনসংখ্যা সংক্রান্ত তাদের নীতিমালাগুলো পুনর্বিবেচনা করছে এবং এক-তৃতীয়াংশেরও বেশী দেশ আইসিপিডির লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে মিলিয়ে তাদের নীতি পুনর্নির্ধারন করেছে।

লিঙ্গগত সমতা প্রতিষ্ঠা এবং নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ দেশ নতুন নীতি বা আইন চালু করেছে। নারীর অধিকার রক্ষায় ল্যাটিন আমেরিকার সবগুলো দেশ হয় নতুন আইন বা নীতি প্রবর্তন করেছে অথবা প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন সূচিত করেছে। বাংলাদেশসহ অর্ধেকেরও বেশী এশীয় দেশ এবং বেশ কয়েকটি আফ্রিকান দেশ উত্তরাধিকার, সম্পত্তি ও কর্মসংস্থান প্রভৃতি ক্ষেত্রে নারীর অধিকার নিশ্চিত করতে আইন প্রনয়ন করেছে। যৌন ও প্রজনন আচরণ এবং পারিবারিক ও সামাজিক ভূমিকায় পুরুষের দায়দায়িত্ব বাড়াতেও পদক্ষেপ নিয়েছে বেশ কিছু দেশ।

লিঙ্গগত সহিংসতা এবং অন্যান্য ক্ষতিকর সনাতন রীতিনীতি বিলোপের ব্যাপারে উদ্যোগ বেড়েছে। নারীর খাৎনা, ধর্ষন, জোর করে বিয়ে, গার্হস্থ্য সহিংসতা, যৌতুকের কারণে হত্যা ও সহ মরণ প্রথা প্রভৃতি বন্ধ করতে অনেক দেশই বা পারিবারিক কোড সংশোধন করেছে। ১৫ টি আফ্রিকান দেশে নারীর খাৎনা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

পাঠসংক্ষেপ:

প্রজননশীলতা, মরণশীলতা, এবং অভিগমনের জনমিতিক প্রক্রিয়া একটি জনসংখ্যা বা দেশের জৈবিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, ভৌগোলিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই সমস্ত উপাদান বা নিয়ামক জনমিতিক প্রক্রিয়াকে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে। এ ধরণের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কারণে বিশ্ব জনসংখ্যা বিশেষ আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে।

এই পাঠে আমরা জনসংখ্যা পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন প্রচেষ্টার প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত বিষয়াদির উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি।

- বিংশ শতাব্দীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পর্যালোচনা; এবং

- জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রক্রিয়া

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৩.১৬

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. শূন্যস্থান পূরণ করুনঃ

১.১. বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে প্রায় ২ মিলিয়ন জনসংখ্যা শতাব্দীর শেষে ------ মিলিয়নে দাঁড়িয়েছে।

১.২. ১৯৯৯ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে ------- মিলিয়ন জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে।

১.৩. ১৯৫০ সালের পর থেকে গড় আয়ু ৪৬ থেকে বেড়ে ------- হয়েছে।

১.৪. জনসংখ্যা সবচাইতে বেশী বাড়ছে ------ সংলগ্ন আফ্রিকায়।

১.৫. আফ্রিকা ------ ও ল্যাটিন আমেরিকার ৬২ টি দেশের ৪০ শতাংশের বেশী মানুষের বয়স ১৫ এর নীচে।

২. সত্য হলে 'স' মিথ্যা হলে 'মি' লিখুনঃ

২.১. বিশ্বে এখন বৃদ্ধের সংখ্যা অতীতের যে কোন সময়ের চাইতে বেশী।

২.২. সাহারা সংলগ্ন আফ্রিকা অঞ্চলে মৃত্যুর সব চাইতে বড় কারণ হচ্ছে ক্যান্সার।

২.৩. বিশ্বের মাথাপিছু খাদ্যশস্য উৎপাদন গত এক দশক ধরে স্থির রয়েছে।

২.৪. বিশ্বব্যাপী প্রতি বছর শহরবাসীর সংখ্যা ৬ মিলিয়ন হারে বাড়ছে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১. জনমিতিক পরিবৃদ্ধিকাল তত্ত্ব বা ধারা কাকে বলা হয়?

২. জনমিতিক পরিবৃদ্ধিকাল তত্ত্ব পর্যায় সমূহের বৈশিষ্ট্য কি কি?

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. বিশ্ব জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে উন্নয়ন সমন্বয় কৌশল সমূহ নির্দেশ কর।

২. জনসংখ্যা পরিবর্তনের সাম্প্রতিক ধারা বর্ণনা করুন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রতিক্রিয়া কি?

৩. জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ক বিশ্ব কৌশল অনুসন্ধান সম্পর্কিত কায়রোর মতৈক্য সম্পর্কে বর্ণনা দিন।

পাঠ ৩.১৭ জনসংখ্যা পরিকল্পনা এবং উন্নয়নঃ জনসংখ্যার প্রবণতা

এই পাঠ শেষে আপনি-

- জনসংখ্যা পরিকল্পনা এবং উন্নয়ননের অন্তর্গত জনসংখ্যা প্রবণতা;
- জনসংখ্যা পরিবর্তন;
- প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার; এবং
- অংশীদারিত্ব ও ক্ষমতায়ন সম্পর্কে ধারনা লাভ করবেন।

উচ্চ জন্ম ও মৃত্যু হার থেকে নিম্ন জন্ম ও মৃত্যুহারের দিকে ক্রান্তিকাল চলছে এবং অনেক দেশই এটা অর্জন করেছে। প্রতিষেধক ব্যবস্থা স্বাস্থ্যসেবার উন্নতি মৃত্যু হার বিশেষত শিশু মৃত্যু হার (দুই-তৃতীয়াংশ) নাটকীয়ভাবে হ্রাস করেছে। ফলে গত অর্ধশতকে বিশ্বে গড় আয়ু ৪৫ থেকে বেড়ে ৬৬ হয়েছে। অবশ্য এটা অগ্রগতিহীন অঞ্চল ও দেশভেদে অন্যরকম।

উর্বরতাও কমেছে তবে সমহারে নয়। বিশ্বের ৬১ টি দেশে যেখানে জনসংখ্যার ৪৪ শতাংশের বাস, দম্পতিরা তাদের প্রতিস্থাপন সংখ্যাও কম অর্থ্যাৎ দুই এর কম সন্তানের বাবা-মা। কিন্তু এই মুহূর্তেও যদি প্রতিস্থাপন হার অর্জন করা যায় তারপরও বিশ্ব জনসংখ্যা বৃদ্ধি আগামী কয়েক দশক অব্যাহত থাকবে, কারণ বিপুল সংখ্যক ছেলে মেয়ে এখন সন্তান উৎপাদনের চূড়ান্ত বয়সে উপনীত হচ্ছে। বিশ্ব জনসংখ্যার সম্ভাব্য বৃদ্ধির দুই-তৃতীয়াংশ হবে এই গতির কারণে। যেসব দেশে উর্বরতা হ্রাস হয়েছে দ্রুত গতিতে, সেখানেই এটা ঘটবে বেশী। নারীর প্রথম জন্ম দেবার বয়স ১৮ থেকে বাড়িয়ে ২৩শে উন্নীত করার মাধ্যমে এই গতি ৪০ শতাংশেরও বেশী কমানো সম্ভব।

৫০ দশকের গোড়ার দিকে উন্নত দেশ গুলোতে দম্পত্তিপিছু সন্তানের সংখ্যা ছিল ২.৮ জন। আজ সেটা হয়েছে ১.৬ জন। স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে ৫০ দশকে নারীপিছু সন্তান সংখ্যা যেখানে ছিল ৬.২, আজ সেটা দাড়িয়েছে এরও কম। ২০৪৫ সাল নাগাদ এটা ২.১ এরও কম হবে বলে ধারণা করা হয়েছে। গত ৫০ বছর উর্বরতা সবচাইতে দ্রুত গতিতে কমেছে ল্যাটিন আমেরিকায় (৫.৯ থেকে ২.৭) ও এশিয়ায় (৫.৯ থেকে ২.৬), মধ্য গতিতে কমেছে উত্তর আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যে (৬.৬ থেকে ৩.৫) এবং আরো ধীর গতিতে কমেছে সাহারা সংলগ্ন আফ্রিকায় (৬.৫ থেকে ৫.৫)।

হ্রাসমান জন্ম হার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা তৈরী করে। কারণ একদিকে বেড়ে উঠা যুবক বয়সীরা কর্মশক্তিতে যুক্ত হচ্ছে আর অন্যদিকে শিশু জন্মের হার কমে যাচ্ছে। পূর্ব এশিয়া ইতিমধ্যেই জনসংখ্যার এই বোনাসের ফসল ঘরে তুলতে শুরু করেছে। তাদের গার্হস্থ্য ও জাতীয় সঞ্চয় ও বিনিয়োগ এবং সামাজিক খাতে ব্যয় বেড়েছে। আগামী দুএক দশকে দক্ষিণ এশিয়া ও আফ্রিকাও অনুরূপ সৌভাগ্যের অধিকারী হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এটা অর্জন করতে হলে শিক্ষা ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে হবে এবং অন্যান্য সহায়ক কার্যক্রম হাতে নিতে হবে।

অবশ্য বিশ্বজুড়ে চলতে থাকা একটি আর্থিক বিপর্যয় সামাজিক খাতে বিনিময়ের মাধ্যমে এই অর্জনকে ব্যাহত করতে পারে। ইউএনএপপি-এ পরিচালিত এক জরিপ থেকে জানা যায়, ১৯৯৭ সালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যে আর্থিক সঙ্কট শুরু হয়েছে তার ফলে লাখ লাখ মানুষ দারিদ্র ও দৈন্যদশায় নিক্ষিপ্ত হয়েছে। সামাজিক খাতে ব্যয় হ্রাস পাওয়ায় এক্ষেত্রে বড় ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে, বিশেষ করে নারীর অধিকার ও তার প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার খর্ব হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, এইডস এবং এসটিডি নিরোধ কর্মসূচীতে বরাদ্দ কমানো হয়েছে।

উন্নত স্বাস্থ্যসেবা এবং পছন্দের সুযোগ বৃদ্ধি পাওয়ার বিশ্ব জুড়ে উর্বরতার হার প্রত্যাশার চেয়েও দ্রুত হ্রাস পেয়েছে। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক দপ্তরের জনসংখ্যা শাখার হিসাব মতে ২০৫০ সাল নাগাদ বিশ্বের জনসংখ্যা হবে ৮.৯ বিলিয়ন। অথচ ১৯৯৬ সালে ইহা অনুমান করা হয়েছিল ৯.৪ বিলিয়ন। তবে এর সবটুকুই সুখবর নয়; জনসংখ্যায় এই হ্রাসের এক-তৃতীয়াংশ ঘটবে সাহারা সংলগ্ন এবং ভারতীয় উপমহাদেশের কিছু কিছু অংশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়া এইডস ছাড়া যা হওয়ার কথা ছিল তার চেয়ে ৭ বছর কম। অবশ্য এই দেশ গুলোতে উচ্চ জন্ম হার অব্যাহত থাকায় জনসংখ্যা হ্রাস পাবে না। বতসোয়ানায় প্রতি ৪ জন প্রাপ্ত বয়স্কের একজন এইডস আক্রান্ত এবং সেখানে ৮০ দশকের শেষে যেখানে গড় আয়ু ছিল ৬১ বছর আজ সেখানে দাঁড়িয়েছে ৪৭ বছর। ধারণা করা হচ্ছে ২০০৫-১০ সাল নাগাদ সেটা দাঁড়াবে ৩৮ এ। তারপরও ২০৫০ সাল নাগাদ সেখানকার জনসংখ্যা এখনকার প্রায় দ্বিগুন হবে। এইডস সংক্রামণ হ্রাস বা একেবারে বন্ধ করতে হলে দরকার প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও এই সংক্রামণের পরিণতি সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি। যেহেতু সংক্রমণের অর্ধেকেরও বেশী ঘটে অনুর্ধ্ব ২৪ বছর বয়সীদের মধ্যে, তাই জরুরী ভিত্তিতে তাদের এ সংক্রান্ত চাহিদা মেটানোর ব্যবস্থা করা উচিত।

জনবিন্যাসে পরিবর্তন

অঞ্চলভেদে বৃদ্ধির হারে ভিন্নতা, বর্ধিত নগরায়ন এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন লক্ষনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠায় বিশ্ব জনবিন্যাসে পরিবর্তন ঘটছে। যেমন ১৯৬০ সালে বিশ্ব জনসংখ্যার ৭০ শতাংশ বাস করত উন্নয়নশীল দেশ গুলোতে। এখন এটা ৮০ শতাংশ। আর জনসংখ্যা বৃদ্ধির ৯৫ শতাংশ ঘটে এসব দেশে।

১৯৬০ সালের তুলনায় আফ্রিকার জনসংখ্যা বেড়ে দ্বিগুন হয়েছে এবং দ্রুততম হারে বাড়ছে। ১৯৬০ সালে ইউরোপের জনসংখ্যা ছিল আফ্রিকার দ্বিগুন অথচ অনুমান করা হচ্ছে ২৯৫০ সাল নাগাদ বিশ্বে আফ্রিকানের সংখ্যা হবে ইউরোপিয়ানদের ৩ গুন। বিশ্বের সবচাইতে জনবহুল অঞ্চল এশিয়ার জনসংখ্যা ১৯৬০ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত দ্বিগুন হয়েছে। ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় দেশ গুলোতেও তাই হয়েছে। অন্যদিকে উত্তর আমেরিকার জনসংখ্যা বেড়েছে ৫০ শতাংশ আর ইউরোপের মাত্র ২০ শতাংশ। এই দুই অঞ্চলের জনসংখ্যা এখন মোটামুটি স্থির। সামাজিক পরিবর্তনের চালিকা শক্তি হচ্ছে নগরগুলো আর উন্নয়নশীল দেশ গুলোতে এ গুলো ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত হচ্ছে। ১৯৬০ সালে প্রতি ৩ জন মানুষের একজন ছিলেন নগরবাসী, বর্তমানে এই অনুপাত প্রায় অর্ধেক। অনুমান করা হচ্ছে ২০৩০ সাল নাগাদ ৬০ শতাংশেরও বেশী মানুষ হবেন নগরবাসী। এই সময়ে ১ মিলিয়নের বেশী জনসংখ্যার মেগাসিটির সংখ্যাও বাড়বে। ১৯৬০ সালে বিশ্বে মেগাসিটি ছিল মোটে দুটি। আজ এই সংখ্যা ২৪টি আর ২০১৫ সাল নাগাদ এইসংখ্যা হবে ২৬ টি। এর মধ্যে ২২টির অবস্থান হবে স্বল্পোন্নত অঞ্চলে। এর ১৮ টিই এশিয়ায়।

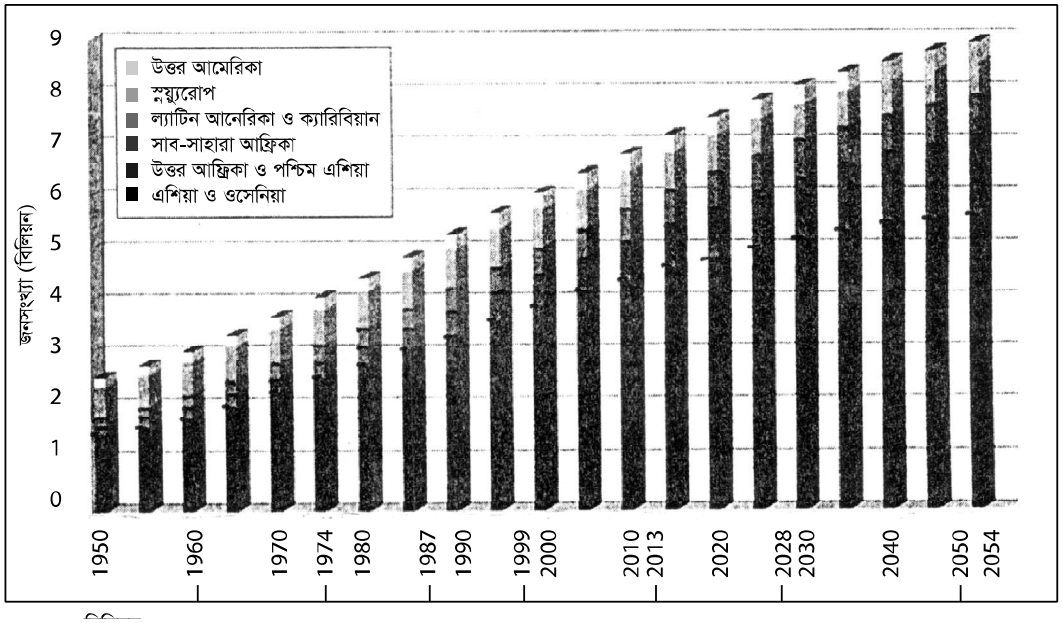

চিত্র: ৩.১৭.১: বিশ্ব জনসংখ্যার আঞ্চলিক বিন্যাস, ১৯৫০-২০৫০, (সূত্র: UNO, 1999)।

অভিবাসীর সংখ্যা এবং তাদের কারণে তৈরী হওয়া ইস্যু দুটোই বৃদ্ধি পাওয়ায় বিশ্বের সকল অঞ্চলেই আন্তজার্তিক অভিগমন এখন নীতিনির্ধারণী এজেন্ডার উপরে স্থান পাচ্ছে। ১৯৬৫ থেকে ১৯৯০ এর মধ্যে অভিবাসীর সংখ্যা গড়ে ৭৪ মিলিয়নের স্থলে ১.২ বিলিয়নে দাঁড়িয়েছে। অভিবাসী শ্রমিকরা তাদের নিজ দেশে প্রতি বছর গড়ে ৭০০ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স আকারে পাঠাচ্ছে। শিল্পোন্নত অনেক দেশই এসব শ্রমিকের শ্রম ও দক্ষতার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। নারী অভিগমনকারীর সংখ্যাও বাড়ছে। ২০১০ সালের হিসাবে মোট অভিগামীর অর্ধেকই নারী। এরা আবার শোষণ ও নির্যাতনেরও শিকার হচ্ছে।

ক্রমবর্ধমান মানুষের জন্য খাদ্য ও পানির ব্যবস্থা করা এখন একটি বড় উদ্বেগের বিষয়। এক দশকেরও বেশী সময় ধরে বিশ্বে খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ স্থির হয়ে পড়ছে। সাম্প্রতিক এক জরিপ অনুযায়ী ২০৫০ সাল নাগাদ বিশ্ব জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ এমন দেশগুলোর বাসিন্দা হবে, যেসব দেশে পরিষ্কার পানির অভাব লেগেই থাকবে।

প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার

কায়রো সম্মেলনে প্রজনন অধিকারের ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তাতে রয়েছে বিয়ে, সন্তান গ্রহণ দুই সন্তানের মধ্যেকার বিরতি ইত্যাদি ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার: যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যের সর্বোচ্চ মান অর্জনের অধিকার এবং যৌন নির্যাতন ও বলপ্রয়োগ থেকে মুক্তি।

মানসম্মত প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার চাহিদা আগের যে কোন সময়ের চাইতে বেশী। সুতরাং এমন একটি সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি গুরত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে যেখানে নারী ও পুরুষ তাদের জীবন সম্পর্কে স্বাধীন ভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। গর্ভধারণ সংক্রান্ত জটিলতায় বিকাশশীল দেশগুলোতে প্রতিবছর ০.৬ মিলিয়ন নারী মৃত্যুবরণ করে এবং আরো প্রায় ১ মিলিয়ন নারী সংক্রমণ বা

অন্য কোন রোগে আক্রান্ত হন। অনিরাপদ প্রক্রিয়ায় গর্ভপাত করাতে গিয়ে প্রতিবছর প্রায় মারা যায় ৭০ হাজার নারী। বিশ্বে প্রতিবছর নিরাময়যোগ্য যৌনবাহিত রোগে আক্রান্ত হন ত্রিশ মিলিয়নেরও বেশী মানুষ। প্রতি মিনিটে নতুন করে ১১ জনের মধ্যে এইচআইভি সংক্রামণ ঘটেছে। প্রতি বছর বিশ্বে ১৭ মিলিয়ন নারী গর্ভধারন করছেন এবং এর অর্ধেকই হয় অবাঞ্চিত না হয় অসময়োচিত। ৩৫ মিলিয়নেরও বেশী নারী নিরাপদ ও কার্যকর জন্মনিরোধক পদ্ধতি লাভে বঞ্চিত থাকেন। প্রতি বছর ১৩ কোটি শিশু জন্মের মধ্যে অর্ধেক ক্ষেত্রেই প্রশিক্ষিত সহায়তাকারী থাকেন না। নারীদের মধ্যে অর্ধেকের বেশির ভাগই জীবনে কোন না কোনো ধরনের লিঙ্গগত সন্ত্রাসের শিকার হন। প্রতিবছর প্রায় ২০ লাখ বালিকা বা তরুণী এফজিএম এর ঝুঁকির মধ্যে বসবাস করে। বিশ্বে মোট ১ বিলিয়ন মানুষ লিখতে বা পড়তে পারে না। এদের অর্ধেকই নারী।

কায়রোতে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে বিভিন্ন দেশ প্রজনন স্বাস্থ্যে সেবা উন্নত করতে এবং সেবা গ্রহণকারী কেন্দ্রিক সেবা প্রদান এবং নতুন নতুন তথ্য দিয়ে তাদের পছন্দের অবকাশ সৃষ্টির জন্য নানান পদক্ষেপ নিয়েছে।

২০০৫ থেকে ২০১০ এর মধ্যে উন্নয়নশীল দেশ গুলোতে জন্মনিরোধক ব্যবহার বছরে ৩.৫ শতাংশ হারে বেড়েছে। তবে ২০ থেকে ২৫ শতাংশ সক্ষম দম্পত্তির জন্মনিরোধক চাহিদা এখনও অপূরিত থেকে যাচ্ছে। চাহিদা অপূরিত থাকার এ হার সাহারা সংলগ্ন আফ্রিকায় সর্বোচ্চ (২৯ শতাংশ) আর সর্বনিম্ন উত্তর আমেরিকা ও ক্যারিবীয়ায় (১৮ থেকে ২০ শতাংশ)। পাশাপাশি যৌনবাহিত সংক্রমণ প্রতিরোধ এবং গর্ভধারন রোধে নারী ও পুরুষের জন্য আরো উন্নত জন্মশাসন পদ্ধতি বের করতে আরো গবেষণা দরকার হয়ে পড়েছে।

এখন যে সমস্যাটি মোকাবেলা করা কঠিন বলে প্রতীয়মান হচ্ছে তা হলো মাতৃমৃত্যুর হার কমানো। পরিচালিত সমীক্ষা ও অর্জিত অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, উন্নত প্রসূতি স্বাস্থ্যসেবার জন্য দরকার উন্নত সাধারণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, জরুরী সেবা দান ব্যবস্থা এবং কার্যকর সেবা নিশ্চিত করতে প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মী। এগুলো সবই নীতিগত ভাবে অগ্রাধিকার প্রদান ও প্রয়োজনীয় সম্পদ সংকুলান সাপেক্ষে। অবিবাহিত কিশোর কিশোরী এবং বিবাহিত বা অবিবাহিত প্রাপ্ত বয়স্ক নারী পুরুষের কাছে উপযুক্ত তথ্য এবং সেবা পৌঁছে দেওয়া অনেক দেশেই একটি সমস্যা।

১৯৯৯ সালে আইসিপিডির পঞ্চম বার্ষিক পর্যালোচনায় প্রতি-প্রসবের সময় দক্ষ ও সুপ্রশিক্ষিত সেবাদানকারীর সেবা নিশ্চিত করতে প্রজনন সংক্রান্ত আইন সংস্কার করতে ও এই খাতে বরাদ্দ বাড়াতে: এ সব কর্মসূচীতে বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও বেসরকারী খাতকে জড়িত করতে: পুরুষের দায়দায়িত্ব বাড়াতে, সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা হিসাবে এইচআইভি এইডসসহ যৌনবাহিত রোগ নির্ণয় ব্যবস্থা ও এ ব্যাপারে পরামর্শ সেবা নিশ্চিত করতে আহবান জানিয়েছে।

ঐ পর্যালোচনায় সরকার গুলোর প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে দায়িত্বশীল যৌন আচরণ উৎসাহিত করতে, শিশুদের উপর যৌন নির্যাতন বন্ধ করতে, শরণার্থীদের জন্যও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা ও পরামর্শ নিশ্চিত করতে এফজিএম এর মত ক্ষতিকর সনাতন আচার বিলোপ করতে এবং কিশোর বয়সীরা যাতে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ও দায়িত্বশীল জীবন নির্বাহ করতে পারে সেজন্য তথ্য ও সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করারও আহবান জানানো হয়।

অংশীদারিত্ব ও ক্ষমতায়ন

কায়রো এজেন্ডাকে এগিয়ে নেবার ক্ষেত্রে এনজিও, সংসদ সদস্য, ধর্মীয় নেতা, বেসরকারী খাত ও সামাজিক শক্তিগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। অনেক সরকারই বিশেষত পৌছানো এমন সব জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসূচী প্রনয়ন ও সেবা প্রদানে সুশীল সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে।

আইসিপিডির পর গত ক'বছরে সুশীল সমাজ ও সরকারের মধ্যে সম্পর্ক উত্তরোত্তর বেড়েছে। প্রজনন স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করার এনজিওর সংখ্যা বেড়েছে এবং তাদের বর্ধিত উপস্থিতি এক্ষেত্রে শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। অনেক দেশেই এনজিওগুলো কেবল যে প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার এবং লিঙ্গগত সমতা প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা রাখছে তাই নয়, পাশাপাশি নারীর সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠাতে অবদান রাখছে। আইসিপিডি কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকারের কার্যক্রম তদারকিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

তবে সাফল্য নির্ভর করছে পারস্পরিক সহায়তা পুষ্ট অংশীদারিত্ব, অংশীদারিত্বের বিষয়টি কার্যকরভাবে এগিয়ে নেয়া এবং যৌথ অংশী দারিত্বের ব্যাপারে সরকারী কর্মকর্তাদের সমর্থন পাওয়ার উপরে। ১৯৯৮ সালে চালানো এক জরিপে দেখা যায়, ১১৪ টি দেশের মধ্যে মাত্র ৪৯ টি দেশ নীতি-নির্ধারন ও প্রকল্প বাস্তবায়নে এনজিওগুলোকে জড়িত করার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য কোন ব্যবস্থা নিয়েছে (UNO,1990)।

কায়রো সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী সরকারগুলো একমত হয়েছিল যে, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোর মধ্যেমেই পরিবার পরিকল্পনা সহ প্রজনন স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং সম্পদের সীমাবদ্ধতার মধ্যে এ ধরনের একীভূত ব্যবস্থা চালু করা অনেক দেশের জন্যই একটি চ্যালেঞ্জ। অনেক উন্নয়নশীল দেশই স্বাস্থ্যসেবা এবং পরিবার পরিকল্পনা সেবা সম্পূর্ণ আলাদাভাবে দেয়া হয়। এই দুই ক্ষেত্রের প্রশাসন, কর্মী, সেবা সরবরাহ ব্যবস্থা সবই আলাদা। সুতরাং একই ছাদের নীচে থেকে একই কর্মী বাহিনী নিয়ে এই দুটির সমন্বিত ব্যবস্থা চালু করা একটি কঠিন চ্যালেঞ্জ। সম্পদের সীমাবদ্ধতা একে আরো কঠিন করে তুলছে। অবশ্য অনেক দেশই এ ধরনের সমন্বিত ব্যবস্থা চালুর ক্ষেত্রে অনেক অগ্রগতি অর্জন করেছে। সবগুলো দেশকেই এটা করতে সক্ষম করে তোলা একটি অগ্রাধিকার (UNO.1999)।

১৯৯৪ সালে কায়রোয় এবং নিউইয়র্কে পঞ্চম বার্ষিক মূল্যায়নে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য দরকার আরো রাজনৈতিক অঙ্গীকার, জাতীয় সক্ষমতা তৈরী, বর্ধিত আন্তর্জাতিক সাহায্যে ও বর্ধিত জাতীয় সম্পদ সৃষ্টি। তাছাড়া এনজিও, ধর্মীয় গ্রুপ, সংসদীয় নেতা, প্রশিক্ষক ও বেসরকারী খাতের সঙ্গে কার্যকর ও স্বচ্ছ অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার উপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

কায়রোতে সরকারগুলো একমত হয়েছে যে, জনসংখ্যা ও প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কর্মকান্ডের জন্য ২০০০ সালের মধ্যে প্রতিবছর ১৭০০ কোটি ডলার প্রয়োজন হবে। এর দুই-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ১১৩০ বিলিয়ন ডলারের সংস্থান করবে উন্নয়নশীল দেশগুলো নিজেরাই এবং বাকী ৫৭০ বিলিয়ন ডলার আসবে দাতাদের কাছ থেকে।

এ সময়ের মধ্যে বিকাশশীল দেশগুলো আভ্যন্তরীণভাবে ৭৭০ বিলিয়ন টাকা বিনিয়াগের অঙ্গীকার করেছে। এটা তাদের লক্ষমাত্রার দুই-তৃতীয়াশ। অবশ্য এ অঙ্গীকার বড় কয়েকটি দেশের মধ্যে সীমিত। শীর্ষস্থানীয় দাতাদের মধ্যে নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে ও ডেনমার্ক জনসংখ্যা সহ অন্যান্য উন্নয়ন সাহায্য খাতে তাদের মোট জাতীয় আয়ের একটা বড় অংশ বরাদ্দ করেছে। অন্যদের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া, ফিনল্যান্ড ও যুক্তরাজ্য জনসংখ্যা খাতে তাদের অংশীদারিত্ব উল্লেখযোগ্য হারে বাড়াতে শুরু করেছে।

আর যুক্তরাষ্ট্র এ ক্ষেত্রে তাদের সহায়তার মাত্রা হ্রাস করেছে, যদিও তারা এখনো এক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় দাতা (UNO.1999) দেশ।

পাঠসংক্ষেপ:

উচ্চ জন্ম ও মৃত্যু হার থেকে নিম্ন জন্ম ও মৃত্যুহারের দিকে ক্রান্তিকাল চলছে এবং অনেক দেশই এটা অর্জন করেছে। প্রতিষেধক ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যসেবার উন্নতি মৃত্যু হার বিশেষত শিশু মৃত্যু হার (দুই-তৃতীয়াংশ) নাটকীয়ভাবে হ্রাস করেছে। ফলে গত অর্ধশতকে বিশ্বে গড় আয়ু ৪৫ থেকে বেড়ে ৬৬ হয়েছে।

হ্রাসমান জন্ম হার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা তৈরী করে। কারণ একদিকে বেড়ে উঠা যুবক বয়সীরা কর্মশক্তিতে যুক্ত হচ্ছে আর অন্যদিকে শিশু জন্মের হার কমে যাচ্ছে। পূর্ব এশিয়া ইতিমধ্যেই জনসংখ্যার এই বোনাসের ফসল ঘরে তুলতে শুরু করেছে। তাদের গার্হস্থ্য ও জাতীয় সঞ্চয় ও বিনিয়োগ এবং সামাজিক খাতে ব্যয় বেড়েছে। আগামী দুএক দশকে দক্ষিণ এশিয়া ও আফ্রিকাও অনুরূপ সৌভাগ্যের অধিকারী হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এটা অর্জন করতে হলে শিক্ষা ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে হবে এবং অন্যান্য সহায়ক কার্যক্রম হাতে নিতে হবে। এই পাঠে জনসংখ্যা পরিকল্পনা এবং উন্নয়নের আলোকে জনসংখ্যার প্রবণতা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৩.১৭

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. শূন্যস্থান পূরণ করুনঃ

১.১. হ্রাসমান জন্ম হার ------- সমৃদ্ধির সম্ভাবনা তৈরী করে।

১.২. জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক দপ্তরের জনসংখ্যা শাখার হিসাব মতো ২০৫০ সাল নাগাদ বিশ্বের জনসংখ্যা হবে ------- বিলিয়ন।

১.৩. ১৯৯০ সালের হিসাবে মোট অভিগামীর ------- নারী।

১.৪. ১৯৯০ থেকে ১৯৯৫ এর মধ্যে উন্নয়নশীল দেশ গুলোতে জন্মনিরোধক ব্যবহার বছরে ------- শতাংশ হারে বেড়েছে।

১.৫. ১১৪ টি দেশের মধ্যে মাত্র ------- টি দেশ নীতি-নির্ধারন ও প্রকল্প বাস্তবায়নে এনজিওগুলোকে জড়িত করার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য কোন ব্যবস্থা নিয়েছে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১. বিশ্ব জনসংখ্যার প্রবণতা কেমন?

২. প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার কি?

৩. অংশীদারিত্ব ও ক্ষমতায়নের আত্ম সম্পর্ক কি?

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. বিশ্ব জনসংখ্যার প্রবণতার ধারা বর্ণনা করুন।

২. প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার এবং অংশীদারিত্ব ও ক্ষমতায়ন সম্পর্কে বর্ণনা দিন।

উত্তরমালা : ইউনিট-৩

পাঠ-৩.১
১.১. ভারত, ১.২. ১০, ১.৩. তিন-চতুর্থাংশ।, ২.১. স, ২.২. স, ২.৩. স, ২.৪. মি।
পাঠ-৩.২
১.১. কালীক, ১.২. হাজার, ১.৩. ১০, ৫০।
২.১. স , ২.২. মি, ২.৩. স, ২.৪. স।
পাঠ-৩.৩
১.১. ১, ১.২. হাজার। ২.১. স , ২.২. মি, ২.৩. স, ২.৪. স।
পাঠ-৩.৪
১.১. অভিগমন, ১.২. স্থায়ী, ১.৩. স্থান, ১.৪. সামাজিক, ১.৫. আভ্যন্তরীণ, ১.৬. আন্তর্জাতিক।
পাঠ-৩.৫
১.১. স ১.২. মি ১.৩. মি ১.৪. স ১.৫. স
পাঠ-৩.৬
১.১. আন্তর্জাতিক, ১.২. পরিসংখ্যান, ১.৩. মরণশীলতা।
পাঠ-৩.৭
১.১. প্রজননশীলতা, ১.২. পরিবর্তন, ১.৩. কাছাকাছি , ১.৪. প্রাচীন, ১.৫.৭৫।
পাঠ-৩.৮
১.১. ০.৩ ১.২. ১.৮ , ১.৩. উচ্চ ১.৪. ৪.০ ১.৫. নিম্নগতি
পাঠ-৩.৯
১.১. প্রাপ্ত, ১.২. মহিলার, ১.৩. নেতিবাচক, ১.৪. বৃদ্ধি, ১.৫. প্রবীনতা।
২.১. স, ২.২. স, ২.৩. মি, ২.৪. স, ২.৫. মি।
পাঠ-৩.১০
১.১. সরলীকৃত, ১.২. গম্বুজাকার , ১.৩. অপ্রশস্ত, ১.৪. উচ্চ মৃত্যু, ১.৫. মৃত্যু, ১.৬. অভিগমন।
২.১. মি, ২.২. স, ২.৩. স, ২.৪. মি।
পাঠ-৩.১১
১.১. জনমিতিক অবস্থা. ১.২. তিন, ১.৩. ৪৯, ১.৪.৭০, ১.৫. নিম্ন।
পাঠ-৩.১২
১.১. স, ১.২. মি, ১.৩. স, ১.৪. স।
পাঠ-৩.১৩
১.১. তুলনা, ১.২. ৯৮ , ১.৩. ২৫, ১.৪. ইউরোপ।
পাঠ-৩.১৪
১.১. পরিবার, ১.২. ২৫০০, ১.৩. ১০টি, ১.৪. ভৌগোলিক, ১.৫. ইউরোপীয়।
২.১. মি, ২.২. স, ২.৩. মি, ২.৪. স।
পাঠ-৩.১৫
১.১. উপাদান ১.২. খৃষ্টান ১.৩. প্রটেষ্ট্যান্ট ১.৪. ইসলাম ১.৫. তৃতীয় ১.৬. চতুর্থ ১.৭. পঞ্চম
পাঠ-৩.১৬
১.১. ৬, ১.২. ১, ১.৩. ৬৬, ১.৪. সাহারা, ১.৫. এশিয়া।
২.১. স, ২.২. মি, ২.৩. স, ২.৪. মি।
পাঠ-৩.১৭

১.১. অর্থনৈতিক, ১.২. ৮.৯, ১.৩. অর্ধৈকই, ১.৪. ১.২, ১.৫. ৪৯।

নোট রাখুনঃ